সপ্তম অধ্যায়

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সমাজ দেশ কালের অভিঘাত : আত্মপরিচয় সন্ধান

> ‘‘কী নিয়ে লেখা হবে কবিতা? আমার বাইরের পৃথিবী নিয়ে? না কি আমারই ব্যক্তিগত জগৎ নিয়ে? এই ছিল তর্ক, দেশবিদেশের বহুকালের পুরোনো তর্ক। কিন্তু এই দুই কি ভিন্ন না কি? এই দুইয়ের মধ্যে নিরন্তর যাওয়া-আসা করেই কি বেঁচে নেই মানুষ? তার থেকেই কি প্রতিমুহূর্তে তৈরি হয়ে উঠছে না একটা তৃতীয় সত্তা?...
>
> মরিয়া কোনো ঘরের মেয়ে যদি একদিন ভুখামিছিলে বেরিয়ে আসে পথে, নিষিদ্ধ রেখার ওপারে টেনে নিয়ে সে-মিছিলের কোনো কিশোরীকে যদি হত্যা করে পুলিশ— হঠাৎ তখন ঝলক দিয়ে ওঠে দূরবর্তী তার মায়ের মুখ : দেশব্যাপী যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃত্যু তবে কবিতারই কথা হতে পারে। কিন্তু সেই একই সঙ্গে কবিতা হতে পারে কবির নিজের জন্ম, তার জেগেওঠা, তার অবয়বহীন অভিমানময় ভালোবাসার বিপুল উত্থান, চরাচরব্যাপী বিষণ্ণতায় ধন্য। এ দুই ভিন্ন নয়, ‘এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল।’... এইভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন।
>
> আমারও তেমনি এক টুকরো থেকে অন্য টুকরোয় অবিরাম যাওয়া, পা তোলা পা ফেলার মতো এক কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছনো।’’[১]

শঙ্খ ঘোষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি। তাঁর কবিতায় যে জীবনবীক্ষা-বিশ্ববীক্ষা উপস্থিত তা কোন বিমূর্ত আকাশলীন ভাবাদর্শ নয়। তাঁর ভাষায় ‘বাইরের দিকে মুখ করা’ এবং ‘ভিতরের দিকে মুখ ঘোরানো’ অর্থাৎ প্রাণময় ব্যক্তির বাস্তবের মূল থেকেই তা উদ্ভূত এবং এই ব্যক্তি কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, বৃহত্তর সমগ্রের অংশ। তাই তাঁর কবিতায় আছে কালগত তাৎপর্য, শিল্পগত আধুনিকতা, সচেতন মানবিক হৃদয়বত্তা ও যুগগত মননধর্মিতা। ‘কী নিয়ে লেখা হবে কবিতা?’— এই ভাবনাই তাঁকে বাইরের পৃথিবী ও ব্যক্তিগত জগৎ-এর দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে তৃতীয় সত্তার নিকটে নিয়ে আসে অর্থাৎ ‘এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল’-এর কবিতায়। এই কবিতায় দেশব্যাপী যন্ত্রণার সঙ্গে নিজের জন্ম জেগে ওঠা আবরণহীন ভালোবাসার বিপুল উত্থান ও চরাচরব্যাপী বিষণ্ণতার কথা আবেগ-মনন-বোধ সমন্বয়ে লিখিত। এই জাগরণের নেপথ্য— বাড়িতে মা এবং স্কুলে সহনশীল রবীন্দ্রানুরাগী বাবার সূত্রে রবীন্দ্র-রচনা-জীবন-পাঠ, শিক্ষক নির্মলচন্দ্র বর্ধনের সহযোগিতায় কল্পনার দুয়ার খোলা—

> ‘‘আর, মনের ওপর প্রভাব যদি বলতে হয় তবে সেটা নিশ্চয় বাবার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের।

বাবা বিশেষভাবেই রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন বলে আমরা ভাইবোনেরা বেশ অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। অনুরাগের একটা আবহাওয়া আমরা পেয়ে গেছি ছেলেবেলাতেই, পড়েও ফেলেছি তখন অনেকখানি।...

আমার ছোটো ভাইয়ের (নিত্যপ্রিয়র) একটা দুরারোগ্য অসুখ হয়েছিল ছোটোবেলায়। কলকাতার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন। পাকশীতে যে কজন ডাক্তার ছিলেন অগত্যা তাঁরাই তখন সবাই মিলে দেখছেন। আমি সবে ক্লাস টেনে উঠেছি— বাবা আমাদের ইংরেজি আর বাংলার ক্লাস নেন— টিফিন পিরিয়ডের আগের ক্লাসটায় বললেন : 'বই থাক। কয়েকটা কবিতা শোনো আজ।' বলে একটার পর একটা পড়ে গেলেন 'নৈবেদ্য'র কবিতা। আমার একটু চমক লাগল। হঠাৎ এসব কেন পড়ছেন বাবা?

স্কুলের প্রায় সঙ্গেই আমাদের বাড়ি। টিফিন পিরিয়ডে দৌড়ে যাই বাড়িতে। গিয়ে দেখি বাইরের ঘরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন একসঙ্গে সবকজন ডাক্তার। ভিতরে গিয়ে শুনি ওঁরা বলে দিয়েছেন এখন যে কোনো মুহূর্তের ব্যাপার। বাবার 'নৈবেদ্য' পড়ানোটা বুঝতে পারলাম তখন।...

আরেকটা ঘটনা সেই ক্লাস টেনেরই মাঝামাঝি সময়কার। বাড়িতে বসেই একরকম পরীক্ষা দেওয়া যায় লোকশিক্ষা সংসদের...

পড়া তো হল... ঘুরতে-ফিরতে তাই ভাবতাম লেখাগুলির কথা। একদিন সন্ধেবেলা, এক বন্ধুকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি একলা, সুন্দর বাতাস বইছে, আকাশভরা তারা, সেদিকটায় তাকিয়ে মন যেন ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, মনে পড়ে যাচ্ছে হঠাৎ 'উৎসর্গ'র কবিতা : 'লক্ষযোজন দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে!' পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে হাঁটছি আর মনে পড়ছে : 'তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে / সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে!' কবিতার লাইনগুলি ভেসে আসছে, সমস্ত শরীর আনন্দে ভরে উঠছে— আর আমার মনে হচ্ছে কবিতাটাকে আমি জীবনের মধ্যে পেয়ে গেছি। পড়বার একটা নতুন আয়তন পেয়ে গেলাম তখন।''[২]

আর অন্যদিকে—

''চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠেরই কথা।...

একজন মাস্টারমশাই। কিন্তু সেই ইংরেজি-অঙ্কের জন্য নয়, তাঁকে কেবলই মনে পড়ে আমার ভিন্ন দুই কারণে। ক্লাস এইটে পড়ি তখন, বিকেলের দিকে যাঁর ক্লাস তিনি আসেননি সেদিন, খয়েরি রঙের রেক্সিনে বাঁধাই লম্বামতো একখানা বই

নিয়ে ঢুকলেন নির্মলবাবু। বললেন : একটা গল্প পড়ি, তোমরা শুধু শোনো। থমথমে গলায় তারপর পড়ে শোনালেন এক রাজার কথা, নির্জন অরণ্যমধ্যে যিনি তাঁর ভাইকে নিয়ে এসে বলছেন : 'আমাকে মারিবে ভাই?' পরে জেনেছি এ হলো 'রাজর্ষি' উপন্যাসের একটা অংশ। পড়ন্ত সেই দুপুর, ভাষার সেই জাদু, নির্মলবাবুর সেই আলতো করে পড়ে যাওয়া— সব মিলে গিয়ে একটা কল্পলোকের দুয়োর যেন খুলে যাচ্ছিল সেদিন। আর এইরকমই আরেকদিন, অনুপস্থিত অরেকজনের ক্লাসে, ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে লিখে নির্মলবাবু শিখিয়েছিলেন কীভাবে কবিতার ছন্দ তৈরি হয়, মিল তৈরি হয়।

এটাকে ঠিক প্রভাব বলা যায় তা হয়তো নয়, কিন্তু একটা উজ্জীবন তো নিশ্চয়।''[৩]

শঙ্খ ঘোষ, মানুষ— সমাজ দেশ কাল আর তাঁর কবিতা পরস্পর বিরোধী বিসংগত ব্যাপার নয় বরং শঙ্খ ঘোষ, মানুষ— সমাজ দেশ-কাল আর তাঁর কবিতার পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এই সচেতন সমাজ-সংবিদ কবির জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির প্রায় এক দশক পরে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার প্রায় অর্ধেক দশক আগে— 'অশ্লেষার রাক্ষুসীবেলায়'। তাঁর প্রথাগত শিক্ষাক্ষেত্র বর্তমান বাংলাদেশ এবং বর্তমান ভারতবর্ষ— পাবনা জেলার পাকশীর 'চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ' এবং পশ্চিমবঙ্গের 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' ও 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়'। এই কবির তরুণবেলায় মনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে ঘাত-প্রতিঘাতের নিদারুণ স্রোত—

''দশ থেকে পনেরো বছর বয়স যখন, পরপর কত-না বড়ো ঘটনার মধ্যে দিয়ে সময় তখন চলছে : যুদ্ধ, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, পঁয়তাল্লিশের নেতাজি উন্মাদনা, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ আর স্বাধীনতা। ছিলাম দূরের এক মফস্বলে, স্বাধীন আর খণ্ডিত দেশের কলকাতায় এসে পৌঁছলাম সেই পনেরো বছর বয়সে। মফস্বলে, বড়োদের আলোচনা শুনে কিংবা খবরের কাগজের মোটা হরফ পড়ে কোনো কোনো ঘটনা মগজের মধ্যে আবছা হয়ে পৌঁছত। কিন্তু চিরকালের সম্বল হয়ে রইল শুধু টুকরো টুকরো কয়েকটা ছবি। র‍্যাশনের দোকানে লাইন দিতে শিখছি; যুদ্ধ চলছে বলে ব্রিজে ওঠা বারণ (বিখ্যাত সারা ব্রিজের ওপারে আমাদের বসবাস); চালের অভাবে বাবার নির্দেশে তরকারি সেদ্ধ খাচ্ছি কদিন; পুলিশ আসবে গুজব শুনে লুকিয়ে ফেলেছি ফ্যাশানদুরস্ত গান্ধীটুপি কিংবা নেতাজির ছবি; ভোরের বেলায় খোলা মাঠে চক্কর দিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়োদৌড়ি করছেন এক দারোগা আর চারিদিকে ঘিরে ধরে লাঠিতে লাঠিতে তাঁকে রক্তাক্ত করছে কয়েকজন— সার বেঁধে অসাড় অন্যেরা ভয়ার্তভাবে তা

দেখছেন; বিপদ-সম্ভাবনায় পাড়া ছেড়ে তুলনায় নিরাপদ পাড়ার দিকে গভীর রাতের মাঠ পেরিয়ে চুপিচুপি চলেছি আমরা লণ্ঠন হাতে; কলকাতা থেকে অজানা এক মানুষ এসে দু-চারজনের সঙ্গে গল্পচ্ছলে বুঝিয়ে চলেছেন কাকে বলে সাম্যবাদ। এর কোনোটারই পুরো তাৎপর্য আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না তখন, কিন্তু আলোড়ন তবু একটা ছিলই।''[৪]

বারো বছর বয়সে প্রথম কবিতা (১৯৪৪) আর সতেরো বছর বয়সের পরিণত লেখা 'কবর' (১৯৪৯); প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''দিনগুলি রাতগুলি'' (১৯৫৬) এবং সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ ''এও এক ব্যথা উপশম'' (২০১৭)। স্বীকার্য, কিন্তু আলোচ্য কবির সতেরো বছর বয়সে 'কবর'-এর মতো আত্মসংকট-সন্ধানযুক্ত কবিতা রচিত হল কেন?— যার পরতে পরতে সমাজ দেশ কাল আত্মসমালোচনা আত্মোৎসর্গ! এখানেই শঙ্খ ঘোষের অনন্যতা— ব্যতিক্রমী এবং একক। কবিতা বিষয়ে তাঁর ভাবনা—

''আমাদের সেই অল্পবয়সে, কবিতা কী আর কবিতা কী নয়, এর সিদ্ধান্ত নিয়ে স্পষ্টই একটা শিবিরবিভাজন ছিল, থাকবারই কথা। কিন্তু কবিতা কী, তার কোনো অগ্রিম হিসেব নিয়ে লিখতে চাইনি কবিতা; এমনকী এও বলা যায় যে, কবিতাই লিখতে হবে এমনও ভাবিনি বেশি। কৈশোর থেকে সেদিন পর্যন্ত, হঠাৎ হঠাৎ লিখতে ইচ্ছে হয়েছে কয়েকটি কথা, যে-কোনো কারণে, আর লিখে গিয়েছি তখন। সে-লেখাকে তো হতে হবে আমারই বোধমতো, আমারই জানা সত্যে। সেটা যদি শেষ পর্যন্ত না পৌঁছয় কোথাও, তাহলে সেদিন তো আমার অক্ষমতা শুধু। সেই অক্ষমতাকে মেনে নিয়ে, জীবনটাকে সেদিন ছুঁতে চেয়েছি আমারই মতো।''[৫]

—'বোধমতো', 'সত্যে'! শঙ্খ ঘোষের জন্ম ১৯৩২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ চীন-জাপান যুদ্ধ, জার্মানীতে নাৎসী দলের জয়— হিটলারের উত্থান ও একছত্র তাণ্ডব, হরিজনদের জন্য গান্ধীজির আমৃত্যু অনশন, ইংরেজ কর্তৃক ভারতের জন্য নতুন শাসনবিধি প্রস্তুতকালে প্রায়! অতঃপর হিটলারের হত্যালীলা তথা ফ্যাসিবাদের তাণ্ডব— সারা পৃথিবী জুড়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান— দামামা! ফল হেতু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা এবং অসংখ্য মৃত্যু-ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ১৯৪৫-এ গিয়ে সমাপ্তি। এই যুদ্ধকালে ভারতবর্ষের অবস্থা ছিল তথৈবচ— ঘরে দ্বন্দ্ব বাইরে মৃত্যু, ফাঁসিকাঠ এবং অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা-মন্বন্তর। তবে এইসবের মধ্যেও মূল লক্ষ্য স্বাধীনতা ছিল মন্ত্র সমান। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভ— প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর স্বাগত ভাষণ—

''ভাগ্যের সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা আমাদের বহুকালের। আজ

সেই মহালগ্ন সমাগত। আমাদের পবিত্র প্রতিশ্রুতি আজ রূপায়িত করতে হবে সামগ্রিকভাবে যা পূর্ণমাত্রায় না হলেও বহুলাংশে তো বটেই। ঠিক মধ্যরাত্রির এই প্রহরে সারা পৃথিবী যখন নিদ্রা নিমগ্ন ভারতবর্ষ জেগে উঠবে জীবনের মুখরতায় মুক্তির জয়গানে। একটি সময় আসে, যদিও ইতিহাসে তার আবির্ভাব বড়োই বিরল, যখন আমরা রিক্ত অতীতকে পিছনে ফেলে নবজীবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই। যখন একটা যুগের অবসান ঘটে এবং একটা জাতির সুদীর্ঘকালের অবদমিত অন্তরাত্মা বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠে। এটা তাই সময়োচিত যে, এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা ভারতবর্ষের সেবায়, এ দেশের আপামর জনসাধারণের সেবায় তথা বৃহত্তর মানবজাতির সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি।... ভারতবর্ষের সেবা হচ্ছে তার লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের সেবা। এর অর্থ হচ্ছে দারিদ্র, অজ্ঞতা, ব্যাধি ও সুযোগের অসাম্যের অবসান। আমাদের প্রজন্মের সবচেয়ে বড়ো মানুষটির স্বপ্ন হচ্ছে প্রতিটি আঁখির অশ্রুবিমোচন করা। এ হয়তো আমাদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু যতদিন আঁখিপাতে অশ্রু ধরবে, যতদিন মানুষের যাতনাভোগ থাকবে। ততদিন আমাদের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।''[৬]

সতেরো বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে লেখেন 'কবর'— উদ্বাস্তু আগমনের সঙ্গে যে কবির আগমন ঘটেছিল স্বাধীন ভারবর্ষের কলকাতায়!

''আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে—
গোপন রক্ত যা-কিছুটুক আছে আমার শরীরে, তার
সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে।
কঠিন মাটির ছোঁয়া বাতাস পেয়েছি এই সমস্ত দিন—
নীচে কি তার একটুও নয় ভিজে?
ছড়িয়ে দেব দু-হাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা,
যেটুকু প্রাই প্রাণের দিশা নিজে।

ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল শুধুই আগলে রাখা
তোমার কোনো কাজেই লাগে নি তা—
পথের কোণে ভরসাহারা পড়ে ছিলাম সারাটা দিন:
আজ আমাকে গ্রহণ করো মিতা।
...

নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।''[৭]

'এ কোন্ দেশ'— জীবন যেখানে অভাবে অত্যাচারে ক্ষুধায় শীতের কামড়ে শীর্ণ হতে বসেছে, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণ বেঁচে থাকাকে গ্লানিময় করে তুলেছে— অবক্ষয় ও আত্মিক সংকটে-সংকটে ক্ষয়ে যেতে বসেছে ভবিষ্যৎ! এই ভয়ংকর সর্বনাশকালে একজন কবির ক্ষীণায়ু জীবন আগলে রাখা সাজে না, সাজে না 'আত্মস্বীকারোক্তিমূলক' কবিতার পর কবিতা। তাই লেখা হয়—

''হায় তোকে ভাত দিই কী করে ভাত দিই হায়
হায় তোকে ভাত দেব কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়

নিভন্ত এই চুল্লি তবে
একটু আগুন দে—
হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে!
দু-পারে দুই রুই কাৎলার
মারণী ফন্দি
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
মৃত্যুতে মন দি'।
...
কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না—
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না—
চলল মেয়ে রণে চলল!
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝন্‌ঝন্ করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল!
পেশির দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল!''[৮]

কবিতাটির 'সূচনাবিন্দু'কথাতে কবি লেখেন—

''সেটা ছিল ১৯৫১ সাল। সকাল বেলায় একদিন কাগজ খুলে দেখি, প্রথম

পাতায় বড়ো বড়ো হরফে কুচবিহারের খবর : পুলিশের গুলিতে কিশোরীর মৃত্যু। তবে, বারো নয়, সে-কিশোরীর ছিল ষোলো বছর বয়স।

বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা। ক্ষোভেলজ্জায় কাগজ হাতে বসে থাকি এই খবরের সামনে। এক কিশোরী? চার বছর পেরিয়ে গেছে স্বাধীনতার পর, আজও এই খবর? ওয়ান্ মোর্ আন্ফরচুনেট। "The Bridge of Sighs"-এর প্রথম লাইনকটা ঘুরতে থাকে মাথার মধ্যে : ওয়ান্ মোর আন্ফরচুনেট্! ওয়ান্ মোর্ আন্ফরচুনেট্!

চার বছর পেরিয়ে গেছে স্বাধীনতার পর, দেশের মানুষের কাছে তার খবর এসে পৌঁছেছে, কিন্তু খাবার এসে পৌঁছয়নি তখনও। চালডালের আর্জি নিয়ে লোকে তাই কখনো-কখনো শহরে এসে দাঁড়ায়, খিদের একটা সুরাহা চায় তারা। তেমনি এক দাবির আন্দোলনে কুচবিহার কাঁপছে তখন। অনেক মানুষের মিছিল চলে এসেছে শহরের বুকে, হাকিমসাহেবের দরবারে।

এসব সময়ে যেমন হয় তেমনই হলো। নিরাপত্তার জন্য তৈরি রইল পুলিশের কর্ডন। নিষিদ্ধ সীমা পর্যন্ত এসে থমকে গেল মিছিল। ঘোষণা আছে যে কর্ডন ভাঙলেই চলবে গুলি, তাই তারা ভাঙতে চায় না নিষেধ। তারা কেবল জানাতে গিয়েছিল তাদের নিরুপায় দশা। তাই নিষেধের সামনে, সারাদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশ আর জনতা।

তারপর ধৈর্য যায় ভেঙে। কার ধৈর্য, তা আমরা জানি না। কিন্তু কাগজে খবর ছিল এই যে, মিছিলের একেবারে সামনে থেকে একটি ষোলো বছরে মেয়েকে কর্ডনের এপারে টেনে নেয় পুলিশ, আর 'অবৈধ' এই সীমালঙ্ঘনের অভিযোগে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তাকে, পথের ওপরই মৃত্যু হয় তার। স্বাধীন দেশের স্বাধীন পুলিশের হাতে স্বাধীন এক কিশোরীর কত অনায়াস সেই মৃত্যু!

এই ছিল খবর। না, আরো একটু ছিল সঙ্গে। ছিল হতভাগ্য সেই মেয়েটির কিছু কথা, তাঁর স্বপ্নের, তাঁর হাহাকারের কথা। সেদিনই, না কি তার পরের দিন? সেটা এখন মনে নেই আর। কিন্তু মনে আছে, বিলাপ করতে করতে বলেছিলেন তিনি, মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল কোনোমতে, কিন্তু কোনো নিষেধ না শুনে কোন্ দুর্মতিতে ওই সর্বনেশে মিছিলে ভিড়ে গেল সে! কী নিয়ে তাঁর জীবন কাটবে এবার!

এ-খবরের পর কিছুদিন ধরে রাগ আর দুঃখের ধ্বনিপ্রতিধ্বনি শোনা গেল দেশ জুড়ে, ঝড় উঠল বিধানসভায়, ক্ষোভের তীব্রতার মুখে সরকার থেকে

তৈরি করে দিতে হলো এক তদন্তকমিশন— এসব সময়ে যেমন হয়। সে-তদন্তের ফল অবশ্য জানা যায় না আর কোনোদিন। তার পর, সময়ের নিয়মে, সবার মন থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় সব— এসব সময়ে যেমন হয়। মিলিয়ে গেল আমারও।”[৯]

‘ওয়ান মোর্ আন্ফরচুনেট্’— স্বাধীনতার চার বছর পরেও স্বাধীন ভারতবর্ষে খাবারের জন্য হাহাকার, খাদ্য আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে পুলিশের গুলি— এক ষোল বছর বয়সী কিশোরীর মৃত্যু! কবিতাটি ১৯৫১ সালে লেখা হলেও হাহাকারকথা— মায়ের ব্যথার কথা গদ্যে লেখা হয় 1976-Ûõþ Âõþ Õï ‡È Õ±ôÂ Âõþ‘ú ±ô± Îõ±ûþ Ëõþ ëÂ Ëõþ‘Õ±ôÂ Âk’ (Afrikaans) ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মাতৃভাষাপ্রেমীদের আন্দোলন এবং তাতে গুলি— বারো বছর বয়সের একটি মেয়ের মৃত্যু নিয়ে ‘Soweto’ কবিতা পাঠের পর। ১৯৫১ সাল এবং ১৯৭৬ সাল— এশিয়া এবং আফ্রিকা, খাদ্য আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলন— ‘নিভন্ত এই চুল্লিতে বোন আগুন ফলেছে!’ আর ‘So-we-to So-we, আর অসমাপ্ত ‘we’ ধ্বনিতে শেষ হয়ে যায় নিবিড় এই কবিতা।’ কী কালাতীত-দেশাতীত মিল! এখানেই শঙ্খ ঘোষের সমাজ দেশ কাল— প্রথম কবিতা থেকে সাম্প্রতিকতম কবিতা।

শঙ্খ ঘোষের কবিতা সমাজ-দেশ-কাল বিচ্ছিন্ন নয়— তাঁর কবিতায় সময়ের অস্থিরতা ক্ষোভ, ক্রোধ অভিমান ভালোবাসা আত্মসংকট-সমালোচনা বেদনা প্রগাঢ় আলো-বোধ-উপলব্ধি প্রকাশিত। আধুনিকতার অনেকান্তিক শর্তে-ধর্মে তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং সামাজিক উপলব্ধির সঙ্গে মিশে আছে এক নিজস্ব শঙ্খ-সুর। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ মূলত তিনটি করে গুচ্ছে বিভক্ত, ব্যতিক্রম অবশ্যই স্বীকার্য। সাধারণীকরণ,এই তিনটি গুচ্ছের প্রথম গুচ্ছে প্রধানত অন্তরের কোমল-লাবণ্যময় অনুভব ব্যক্ত, দ্বিতীয় গুচ্ছে সমাজ দেশ কালের অভিঘাতময় কথা এবং তৃতীয় গুচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় গুচ্ছের স্বর-সুরের সঙ্গে মিশে আছে এক গাঢ় মনন-বোধের অনুভব। গুচ্ছকথা সমানভাবে প্রযোজ্য না হলেও গুচ্ছ ‘নাম’ অতীব ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অর্থবহ। নিম্নে প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থের নাম ও গুচ্ছনামের উল্লেখ করা হল— ‘‘দিনগুলি রাতগুলি ’’ (১৯৫৬)— ‘দিনগুলি রাতগুলি’, ‘যমুনাবতী’ এবং ‘ধানে গানে বসুধায়’; ‘‘নিহিত পাতালছায়া’’ (১৯৬৭)— ‘বিপুলা পৃথিবী’, ‘ঘর’ এবং ‘এখন সময় নয়’; ‘‘তুমি তো তেমন গৌরী নও (১৯৭৮)— প্রথম কবিতাবলীর স্বতন্ত্র কোন নাম নেই, দ্বিতীয় গুচ্ছটির নাম— ‘জলস্রোত’; ‘‘আদিম লতাগুল্মময়’ (১৯৭২)— ‘পাথর’, ‘দল’ এবং ‘চিতা’; ‘‘মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়’’ (১৯৭৪)— ‘নির্বাসন’, ‘চালচলন’ এবং ‘সঙ্গিনী’; ‘‘বাবরের প্রার্থনা’’ (১৯৭৬)— ‘মণিকর্ণিকা’, ‘খড়’ এবং ‘হাতেমতাই’; ‘‘বন্ধুরা মাতি তরজায়’’ (১৯৮৪)— স্বতন্ত্র কোন বিভাগ নেই; ‘‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’’ (১৯৮০)— স্বতন্ত্র কোন পর্ব নেই; ‘‘প্রহরজোড়া ত্রিতাল’’(১৯৮২)—

'ত্রিতাল'; 'কঙ্কাল' এবং 'শিলালিপি'; ''মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'' (১৯৮৪)— 'হেতাল', 'লজ্জা', এবং 'জন্মদিন'; ''ধুম লেগেছে হৃৎকমলে'' (১৯৮৭)— 'ঘাসবিন্দু', 'বৃত্ত' এবং 'সৈকত''; ''লাইনেই ছিলাম বাবা'' (১৯৯৩)— স্বতন্ত্র কোন গুচ্ছ নেই; ''গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ'' (১৯৯৪) — আলাদা কোন গুচ্ছ নেই; ''শবের উপরে শামিয়ানা'' (১৯৯৬)— 'এই গ্রহণের দিনে' এবং 'জলেভাসা খড়কুটো'; ''ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার'' (১৯৯৯)— 'বয়স ভেঙেছে সব বাঁধ' এবং 'পৌঁছতে পারে সর্বনামে'; ''জলই পাষাণ হয়ে আছে'' (২০০৪)— স্বতন্ত্র কোন গুচ্ছ নেই; ''সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি'' (২০০৭)— ১,২ এবং ৩ পর্বে বিভক্ত; ''মাটিখোঁড়া পুরোনো করোটি'' (২০০৯)— 'ঘরখোয়ানো দিন', 'কর্ণের স্বপ্ন' এবং 'আমার অঞ্জলিভাষা'; ''গোটাদেশজোড়া জউঘর'' (২০১০)— 'নজর', 'স্থবির' এবং 'ভাঙাসেতু'; ''হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ'' (২০১১) — 'স্পর্শ', 'রাস্তা' এবং 'বাস্তু'; ''প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে'' (২০১১)— 'ফলক', 'লহমা' এবং 'স্বপ্নগুচ্ছ'; ''বহুস্বর স্তব্ধ পড়ে আছে'' (২০১৫)— 'শূন্যতা পরিধি মাত্র', 'গলায় ঝন্‌ঝন্ করে মালা' এবং 'আছে-র ভাণ্ডার হয়ে আছি'; ''শুনি শুধু নীরব চিৎকার'' (২০১৫)— 'এ এমন সময়, যখন' এবং 'আমার ধর্মের কথা'; ''এও এক ব্যথা-উপশম'' (২০১৭) —'জন্মভূমি', সন্ন্যাসী' এবং 'রাত্রিপথগামী'।

> ''মানুষের সমস্ত সৃজনপ্রেরণার উৎস তার সমাজ ও সময়। সমাজ ও সময়লালিত হবার ফলেই ব্যক্তির সংবেদনা, আবেগ, অনুভব ও জীবনকল্পনা সমষ্টির মধ্যে মুক্তির সন্ধান করে। মানুষের বস্তুগত ও ভাবগত উপকরণপুঞ্জের সুষম ঐক্যে যে সমাজচৈতন্য নির্মিত, তার সঙ্গে সাধর্ম্য ও অন্বেষণের মধ্যেই মানুষের সৃষ্টিশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। মানুষের যূথবদ্ধ জীবনের সূচনা ঘটে তার অস্তিত্ব-সংকট ও সেই সংকট অতিক্রমণের অনিবার্যতাবোধ থেকে। এবং এই অস্তিত্বসংগ্রামরত মানুষের আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, সংঘাত, রক্তপাত, অচরিতার্থতা, যন্ত্রণা প্রভৃতির সামাজিক অভিব্যক্তিই শিল্প-সাহিত্য। এ-কারণেই, যে জৈবিক প্রয়োজনবোধ থেকে মানুষের খাদ্য, বাসস্থান ও সংঘবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত, কবিতার উৎপত্তি ঠিক সেভাবে না হলেও এর উৎসমূলের দ্বন্দ্বময় ও স্তরবহুল বস্তুগজৎ ও ভাবলোকের ক্রিয়াশীল উপস্থিতি বিদ্যমান।''[১০]

ব্যক্তিগত নিভৃতি ও সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে শঙ্খ ঘোষ ক্রমাগত লিখে রেখেছেন ঘরের কথা, স্বদেশের কথা, স্বদেশের সীমা ভেঙে দিয়ে সমগ্রের কথা— অন্ধকার-আলোর কথা, আত্মসংকট-সন্ধান-পরিচয়ের কথা।

> ''এই হলো এই কবির গভীরতম বেঁচে থাকা, ভালোবাসার পথে, ব্যাপ্ত এক না-আমির সঙ্গে অবিরাম যোগের পথে। কিন্তু নিছক উচ্ছ্বাসে মিলিয়ে যায় না এই

ভালোবাসা। তাঁরই ভাষায় বলা যায়, 'চেতনে অধিচেতনে অবচেতনে, প্রকৃতিতে ভালোবাসায়, ইতিহাসে দর্শনে, ব্যক্তিতে সমাজে মিলিয়ে তাঁর এই সম্পূর্ণাঙ্গ বাঁচা।' তাঁর এই বাঁচায় নিজেরও দিকে থাকে তাঁর নজর, কোনো ফাঁকি আর গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার জন্য, প্রতিমুহূর্তে নিজেকে সহজ শালীন সুন্দর রাখবার জন্য। তাঁর এই বাঁচায় এই কবি— যিনি যেকোনো মুহূর্তে ঝলসে উঠতে পারেন সংকীর্ণতা-আর ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে, নারীনিপীড়নের বিরুদ্ধে মানবাধিকার আর গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে— ধারণ করেন আমাদের যুগের সমস্ত কান্নাকে, সুস্থতার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে। আমাদের সময়ের জাগ্রত বিবেক তিনি। নিকট আর দূরের মধ্যে, দৈনন্দিন আর কালপ্রবাহের মধ্যে অনায়াস যাতায়াত তাঁর। 'তোমার ভিতরে গেলে' কবিতায় একটা প্রশ্ন এসেছে এভাবে : 'অর্ধেক ফলের কাছে ম্রিয়মাণ আমারও পথের/শেষ আছে। সেই শেষে লুটোয় যবের শিষ ঝড়ে।/ আর তার মাঝখানে যদি কেউ আজ এসে বলে/'হৃদয় কোথায় তোর অবিমৃশ্য হাড়' তবে তার/কী আর উত্তর আছে অশরীরী অন্ধকার?' এর উত্তর এই হতে পারে যে হৃদয়ই এই কবির অস্তিত্ব, অস্তিত্বই তাঁর হৃদয়। The Notebook of Malte Laurids Brigge বইয়ের পাণ্ডুলিপির এক জায়গায় মার্জিনে লিখেছিলেন রিল্‌কে : To be loved means to be consumed. To love means to radiate with inexhaustible light. To be loved is to pass away, to have is to endure. এর মধ্য থেকে To Love means to radiate with inexhaustible light বাক্যটিকে তুলে নিয়ে প্রয়োগ করা যায় শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে। তাঁর desire নেই, আছে শুধু ভালোবাসা, তাই বিচ্ছুরণ আছে কেবল।''[১১]

—এই কবির কাব্যে কালপ্রবাহ অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ থেকে বিশ্বকালে প্রসারিত। প্রসারিত বলেই তাঁর কবিতার জগৎ যতোটা স্পেস নির্ভর, ততটা টাইম নির্ভর নয় অর্থাৎ তাঁর কবিতায় কালের কথা বর্তমান হলেও সময়ে সময়ে তা পরিবর্তিত। অতএব, সেই অর্থে কবির নানা পর্যায়, কবিতার পর্ব বিভাগ অসম্ভাব্য। তাই ১৯৫১ সালের 'যমুনাবতী'-এর ব্যথা ১৯৭৬ সালে 'Soweto' কবিতা পাঠের অনুভব; সতেরো বছরে লেখা 'কবর' আর তার দুই দশক পরে লেখা 'বাবরের প্রার্থনা' অথবা তারও পরে লেখা 'ছেলের তর্পণ করছে বাবা'— পাশাপাশি রাখলেও রাখা যেতে পারে।

''শঙ্খ ঘোষের কবিতার জগৎ যতটা স্পেস নির্ভর, ততটা টাইম নির্ভর নয়; সময় বা কাল নিশ্চয়ই তাঁর কবিতার নির্মাণে একটি উপাদান কিন্তু সময়ের সঙ্গে তিনি পাল্টেছেন, অর্থাৎ আমরা যাকে কবির নানা পর্যায় বলি, তাঁর কবিতার নানা

পর্ববিভাগ করি, এরকম বিভাজন শঙ্খ ঘোষের কবিতার ক্ষেত্রে করা দুরূহ। আধুনিক জগৎ ও জীবনের যুগপত্তাই তাঁর কবিতার অভিযানে : তাঁর ভাষায় 'বাইরের দিকে মুখ করা' ও 'ভিতরের দিকে মুখ ঘোরানো' একইসঙ্গে সেই 'দিনগুলি রাতগুলি'র কবিতা থেকেই অব্যাহত।... প্রথম কবিতাগ্রন্থ ''দিনগুলি রাতগুলি''তেই রাত্রি ও নৈঃশব্দ-র শীতের বলিমুখ অন্ধ ও বাতাস-এর পাশাপাশিই যুগপৎ থাকে 'শিশুসূর্য' 'একটি দুর্গের কাহিনী' 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে' এবং 'যমুনাবতী'র মতো কবিতা, 'নিহিত পাতালছায়া'র ভিড়, চাবুক কবিতাগুলি, সাধারণত বলা হয় যে কবিতাগ্রন্থ থেকে শঙ্খ ঘোষের কবিজীবনের নতুন পর্যায় শুরু সেই 'বাবরের প্রার্থনা'র পরেও বসানো যায়, আবার ঐ কাব্যগ্রন্থ বা তার পরের কবিতার বেশ কিছু আগে আনা যায়। অর্থাৎ শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতাতেই এই নন্দনতত্ত্বের নির্মাণটি ধরে দেন যে বহুমাত্রিক যুগপত্তাই, simultancity-ই তাঁর বীক্ষার প্রধান কথা : বহুত্ববাদী দৃষ্টিকোণেই তিনি বেঁধে নেন কবিতার জগৎকে, শব্দকে, ডায়লগকে।''[১২]

''নিহিত পাতালছায়া'' কাব্যগ্রন্থের 'বাস্তু', 'ভিড়'; ''আদিম লতাগুল্মময়'' কাব্যগ্রন্থের 'কলকাতা'; ''মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'' কাব্যগ্রন্থের 'বাবুমশাই'; ''প্রহরজোড়া ত্রিতাল'' কাব্যগ্রন্থের 'আত্মঘাত'; ''মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় যে নাগরিক জঙ্গলকথা, আন্তরিকতাহীন যোগহীন জীবন-যাপন, দৈনন্দিন লজ্জাহীন বিজ্ঞাপন, যেন 'এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা'!

''সেও অনেকদিন আগের কথা। বাস থেকে নেমে আসবার চেষ্টা করছি, আর সে-চেষ্টাটার ধরণ যে কী হতে পারে, কলকাতার মানুষ তা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। নামবার অল্প আগে থেকে, প্রায় অল্পবয়সের মতোই, বুকের মধ্যে ছোটো একটা কাঁপুনি শুরু হতে থাকে, অনিশ্চয়তার ভয়, অন্যদের বিব্রত করবার ভয়। তবু, নামতে তো হবেই, এসে গেছে স্টপ। একটু কি দেরি হয়ে গেল? দ্রুততার চেষ্টায় রেগে উঠলেন দু-চারজন। 'নামবেন তো আগে মনে থাকে না?' 'অত ঠেলছেন কেন মশাই?' 'দেখতে পাচ্ছেন না দাঁড়িয়ে আছি? একটু সরু হয়ে যান না, একটু ছোটো হয়ে যান।'

যথেষ্ট সরুই ছিলাম অবশ্য, তবু লজ্জিত হতে হলো কথাকটি শুনে। অনেকটা কি জায়গা জুড়ে আছি তবে? ক্রুদ্ধ সেই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হেসেও ওঠেন অনেকে, না-হাসতে পারলে তো কলকাতার লোক পাগলই হয়ে যেত!''[১৩]

এই সংকটকথার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগ হয় দূরত্বকথা— শহর ও গ্রামের দূরত্ব। শহরের অফিসবাবু

আর সাধারণ গাড়ির চালক, শহরের শিক্ষার্থী আর গ্রামের শিক্ষার্থী— শহরের বাচাল সবজান্তা জাঁকজমক কেন্দ্রে গ্রামের সরল 'আধোজানা' অর্বাচীনের মধ্যে তৈরি হয় এক 'দূরত্বের বিচ্ছেদ'— 'আবরণে আচরণে উচ্চারণে'—

> ''যাদবপুরে যারা পড়তে আসে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু থাকে গ্রাম থেকে সদ্য উঠে আসা যুবক, এই প্রথম তারা কোনো জাঁকজমকের শহরকেন্দ্রে এসে পৌঁছল। একটা ভীরু কাঁপুনি তাদের সমস্ত চোখেমুখে লেগে থাকে তখন, নিজেকে সন্তর্পণ দূরত্বে প্রচ্ছন্ন রাখবার আয়োজনে বিব্রত থাকে তারা। তারপর কেউ কেউ মানিয়ে নেয়, পরিণত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কেউ-বা পারে না তা, বরং নতুন এই আধোজানা সংস্কৃতির সংঘর্ষে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, উন্মাদ হবার ঘটনাও ঘটে যায় কখনো-কখনো।...
>
> আটাত্তর সালে একবছর শান্তিনিকেতনে দিন কাটাবার সময়েও এমন দু-একটি ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল, মনে পড়ে। সরল, অপ্রস্তুত হাসি নিয়ে তাদের মধ্যে একজন বলেছিল, গ্রামে তার বাবা মুদিখানা চালান বলে সহপাঠিনীরা কৌতুক করে, সবার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে তার খুব সংকোচ হয় তাই।
>
> সবাই নিশ্চয় এমন নয়। কিন্তু এ-রকম দু-একটি ঘটনার ইঙ্গিত জানলেও ব্যাপক ব্যর্থতায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে মন। ব্যর্থতা, কেননা এই কি ছিল রবীন্দ্রনাথের মানুষগড়ার কল্পনা? এই কি তার পরিণাম? রবীন্দ্রনাথ যখন কোনো ব্যক্তিনাম না হয়ে গোটা এক জীবনরূপের পরিচয় হয়ে আসেন—তখন এই কি হবে সেই রূপের প্রকাশ?
>
> ফিরে এসেছি শান্তিনিকেতন থেকে, কেটে গেছে তারপর কয়েক বছর। কিন্তু ফুরোয়নি সেইসব মুখের অবিরাম আসাযাওয়া। তারপর একদিন, সেটা বোধহয় একাশি সালের কোনো সকাল, কাগজ খুলে জানি :গ্রাম থেকে আসা তরুণ একটি ছাত্র গলায় দড়ি দিয়েছে শান্তিনিকেতনে, পঁচিশে বৈশাখের ভোরবেলা। পঁচিশে বৈশাখেই? তবে এই কি তার প্রতিবাদ, এই দিনটিকে নির্বাচন করে নেওয়া? আত্মঘাতের আগে, বাবার জন্যে একটি চিরকুট রেখে গেছে সে, ভুল করে যেন ভাইকেও এখানে না পাঠান তার বাবা।''[১৪]

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগহীনতার কথা উঠে আসে। আর তাঁর বেদনা এই উপলব্ধিতেই— স্বরূপহীন বিজ্ঞাপনে, শুদ্ধ মানবিক সম্বন্ধের প্রতিকূলতায়। কেননা, তিনি সমাজ দেশ কাল সমস্ত নিয়েই সম্পূর্ণের কথা ভাবেন এবং বৃহৎ-অখণ্ডের কথা বোঝেন। তবুও অন্ধকার, খণ্ড -খণ্ডের ভার নজরে আসে—

''মানুষের সত্তার সমস্যা এই কবির কবিতায় ফিরে ফিরে আসে। সেটাই শঙ্খর কবিতার না-ছোড় পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ। মানুষের এই সত্তা দেশ দিয়ে ঘেরা, আবার সেই দেশ কালে বিন্যস্ত। একটু অন্তর্নিবিষ্ট হলেই being আর becoming -এর মুখোমুখি যে ছবি দেখতে পাওয়া যায়, অপেক্ষমাণ পরিবর্তমান নিত্যজায়মান যে অস্তিত্বের ছবি, সেই ছবি গড়ে ওঠে দেশকালের এই বিন্যাসে। সব মানুষের অস্তিত্বই এই দেশের উপর পা রেখে বটে, কিন্তু সেই দেশ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'খণ্ডভূমি', তার কালও খণ্ডকাল, নিতান্ত নিজস্ব আয়ুষ্কাল। কিন্তু প্রকৃত মানবধর্মে সমৃদ্ধ যে মানুষ নিতান্ত আমির গণ্ডিতে, সংকীর্ণ দেশ ও সীমাবদ্ধ কালের মধ্যে বন্দী থাকে না। 'নিজের খোলস ভেঙে মানুষের এই আত্মসচেতন বিস্তারের ইচ্ছে' একদিকে বিশ্বের সঙ্গে আমি-র সংযোগ ঘটায়, অন্যদিকে রবার্ট পেন্ ওয়ারেনের ভাষায় ঘটায় 'chronological time and history'-র যোগ।...

তাই দেশগতভাবে 'আমি আর না-আমির জটিল টানাপোড়েনে' এগিয়ে আসে অস্তি। এবং 'ছিন্ন একটা নিমেষও আর একাকী স্বয়ংতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, তার সফলতা গড়ে ওঠে ব্যবধিহীন কালস্রোতের অংশ হিশেবে।''[১৫]

'ভিড়' কবিতায়'—

''ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?
'সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান—'

আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে।
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে?''[১৬]

'কলকাতা' কবিতায়—

''বাপজান হে
কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে
আমিই কিছু জানি না

আমারে কেউ পুছত না

কইলকাত্তার পথে ঘাটে অন্য সবাই দুষ্ট বটে
নিজে তো কেউ দুষ্ট না

কইলকাত্তার লাশে
যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্যিকালের মজা পুকুর
শ্যাওলাপচা ভাসে

অ সোনাবৌ আমিনা
আমারে তুই বাইন্দা রাখিস, জীবন ভইরা আমি তো আর
কলকাত্তায় যামু না।''[১৭]

'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কবিতায়—

''একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্য গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।
...
কে কাকে ঠিক কেমন দেখে
বুঝতে পারা শক্ত খুবই
হা রে আমার বাড়িয়ে বলা
হা রে আমার জন্মভূমি।

বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা-কিছু আজ ব্যক্তিগত।''[১৮]

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় 'দেশোত্তর সময়'-এর ভেতরে আছে 'দেশনিহিত সময়' অর্থাৎ বিশ্বকালের পরতে পরতে মানবকাল ও ব্যক্তিকাল। অনন্তকালপ্রবাহকে স্বীকার করেই তিনি লিখে রাখেন বর্তমানকালকে— তাতে স্বাভাবিকভাবেই জড়িয়ে থাকে অতীত-ভবিষ্যতের বোধ। তাই মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর কেবল কর্মের দায়িত্ব, কেবল কর্মের অধিকার, দীনতার অধিকার। 'সময়ের ইতিহাসে' তাঁর উপলব্ধিটাই মূল।

''আমরা বেঁচে আছি আমাদের একটা সমকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে, এও এক সময়, কিন্তু এ হল এক ব্যক্তিকাল। জীবনানন্দের শব্দ ব্যবহার করে বলা যায়, আরো একটু 'অন্তর্যানী' হয়ে ওঠে যখন আমাদের মন, তখন এই ব্যক্তিকালকে দেখি অন্য একটা সময়ের মধ্যে ভাসমান, তাকে বলা যাক মানবকাল, 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়', সেই হল এক ইতিহাস। কিন্তু আরো একটু 'অন্তর্যানী' হলে তবেই শুধু অনুভব করা যায়, অনুভব করতে হয়, বিশ্বজাগতিক অনাদ্যন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে আমাদের বিম্ব-অবস্থান— ভঙ্গুর ভারাতুর ভীতিময়, আবার সেই একই সঙ্গে রঞ্জিত রহস্যাতুর রতিময়— তার ধারক সেই প্রবাহ হল এক বিশ্বকাল। আমি যদি আমার বাইরে এসে দাঁড়াতে চাই, ব্যাপ্ত কোনো না-আমির মধ্যে, তাহলে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে দেখতে হয় এই ব্যক্তিকাল মানবকাল আর বিশ্বকালের সম্পর্কের মধ্যে। কখনো হয়তো সে-সম্পর্ককে মনে হয় সমন্বয়ের দিকে এগিয়ে-আসা অনেকখানি, কখনো-বা তাকে দেখি এক প্রবল সংঘর্ষে। ঢেউ কখনো কখনো এগিয়ে এসে যেন পৌঁছে যায় তটে, পরের মুহূর্তে প্রবল প্রতিঘাতে সে আবার সরে যায় দূরে, এই আঘাত-প্রত্যাঘাতের মধ্যেই জড়িয়ে যেতে থাকে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিকাল মানবকাল আর বিশ্বকাল, আমাদের সমাজ ইতিহাস আর প্রকৃতি। নিজেকে নিজের বাইরে এনে, এর যে-কোনো-একটার সঙ্গেই নিবিড় সম্পর্কসূত্রে কেউ লিখতে পারেন কবিতা, আর কেউ-বা জড়িয়ে নিতে পারেন এর সবকটিকেই একসঙ্গে, অবলীন এক অভ্যন্তরীণ সম্পর্কে।''[১৯]

ফলত, খাদ্য আন্দোলনের কথা যেমন তাঁর কবিতায় উঠে আসে তেমনি উঠে আসে নকশাল আন্দোলনের কথা এবং পরবর্তীতে লালগড়, নন্দীগ্রামকথা। দিশেহারা সংস্কৃতির মর্মের যোগহীনতার কথার সঙ্গে প্রতিদিনের ঘাত-প্রতিঘাত, জরুরী অবস্থার বিপন্নতা এবং স্বপ্ন-স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণাসকল। তবে শঙ্খ ঘোষের সৎকবিতাসমূহে সচেতন মন থেকে অবচেতন এবং অবচেতন থেকে সুচেতনা আর তাতে ঐতিহ্যের পাঠ নিবিড়ভাবে সংযুক্ত অর্থাৎ 'হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা' বর্তমান। মূলত স্বাধীনতা পরবর্তীতে কবি শঙ্খ ঘোষের কাব্যজীবনের শুরু আর এই সময়েই তিনি লেখেন— 'বন্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা'-এর সঙ্গে 'আমাকে সেই কবিতালোকে উদ্‌ভাসিত করো' অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোতে উজ্জীবনের কথা। কবিতায় ধরলেন বিশ্বচলাচল আর 'আমি'কে, ইতিহাস-সময়-সমাজ আত্তীকরণ করে দৈনন্দিন-এর গলিত মুখ, জরা-ক্লীব-ক্লিন্নতা উত্তীর্ণ কবিতা লিখতে বসলেন। তাঁর কাছে কবিতা কোন মিনারবাসী সৌন্দর্য চর্চার বিষয় না হয়ে বাস্তব ক্ষয়-মৃত্যু-ক্ষোভ-নিষ্ঠাময় কর্মের দায়িত্বের কবিতা, উপলব্ধির কবিতা গুরুত্ব পেয়েছে এবং তা নিশ্চিতরূপেই কবিতা— মগ্নতা, উজ্জীবন আর আত্ম-প্রস্তুতি

অনন্য মাত্রা পেয়েছে।

''আমি দশদিকে চাই, আমার অসুখ ছিল সারাদিন
এখন বাহিরবেলা, স্তব্ধ হাতে দাঁড়িয়েছ তুমি।

আমার কি দেনা ছিল? আমি তো অনেকদিন দায়হীন—
শরীরে অঘ্রান আর সারাবেলা ঝরে বনভূমি।

গোধূলিশহর তুমি খুলে নাও জরিসূতো, ছাড়ো টান
অমার দু-চোখে নীল ধরেছি বিক্ষার বাটি, জল

দ্রুতমুকুরের ছায়া কিছু-কিছু দিঘিভরা অবসান
এখন আমার পথে পথিকজটিল পদতল।

আমি দশদিকে যাই, আমার অসুখ পায়ে বাসা বাঁধে
এতদূর দীর্ঘ স্নেহ, আমারই কি তবে কোনো দায়?

কিছুই জানি না ঠিক কতদূর যাওয়া যাবে অবসাদে
কত প্রতিহত পথ আমার নিজের আয়নায়।''[২০]

—'পাথর' তিনি নিজেই নিজের বুকে তুলেছেন— যা নামাতে পারেন না অথবা তাঁর 'তৃতীয় সত্তা'র' কবিতাতে বারবার এসে উপস্থিত হয় ঘর এবং বাহিরের মিলিত রূপ হিসেবে— জলের ব্যথা, 'রাতের জলভার'কথা। তাঁর 'সবটাই অন্ধকার' আবার 'সবটা আলো'— তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর কোনো শেষ নেই! তিনি লক্ষ্য করেন স্বাধীনতা পরবর্তীতেও নিজশ্রেণীর দোলাচলতা এবং বৃহত্তর বাস্তবের ইতিহাস নিজ অবস্থান থেকে নড়ল না— এই অভিঘাত একই সঙ্গে অবসন্নতা ও উজ্জীবন হিসেবে ধরা পড়ল তাঁর কবিতায়। ক্রমশ প্রসারিত হল তাঁর কবিতার-জগৎ-ভাবনা— বাইরের-ভেতরের ভবন-ভুবনের অন্ধকার, মূর্খ বাচালতার কথা অহংকার-বিজ্ঞাপন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল এবং তা নিজ সমাজ-দেশ-কালের স্পেসে। তাঁর কবিতায় জালিয়ানওয়ালাবাগ হয় আরওয়াল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-মৃত্যুর বিশেষ তাৎপর্য এক দিন হয় কোন এক কিশোরের আত্মহত্যার দিন।

''কবিতায় যদি (বা যখন) সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি থাকে, সে তো আর চালচিত্রের মতো আলগা হয়ে পটভূমিতে ঘিরে থাকে না, থাকে রক্তমাংসে। যখন বলি যে,

হ্যাঁ, রক্তেমাংসেও সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি সবসময়েই থাকে, তখন সেটা কেবল এই অর্থে সত্য যে একজন মানুষের—অতএব একজন কবিরও— সম্পূর্ণ অবস্থান অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির প্রতিবেশে। তাই কবিকে বা তার কবিতাকে আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করতে গেলে চারপাশের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিকে বুঝবার দরকার হতে পারে। কিন্তু কবি যে সবসময় সচেতনভাবে এ নিয়ে লিখবেন বা লিখে যাচ্ছেন, এমন কোনো কথা নেই।''[২১]

আবার অন্যত্র তিনি বলেন—

''যে কোনো মানুষের সমাজের প্রতি কিছু দায় থাকে, কবিরও তা আছে। সে-দায় তিনি ব্যক্তিগত স্তরে বহন করবেন, এটা প্রত্যাশিত। সব কবি তা করেন না, সব ব্যক্তিমানুষও করেন না তা, সেটা ভিন্ন সমস্যা। কিন্তু এই দায় বহন করার মানে এই নয় যে, কবিতায় একজন কবিকে সব সময়ে সমাজের দিকে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। এমনকী কোনোসময়েই তেমন তিনি না বলতে পারেন। তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে তিনি সমাজবিমুখ। কেননা কবিতার মধ্য দিয়ে যদি ভিন্নতর কোনো সত্যের কোনো সুন্দরের বোধ তৈরি হয়ে ওঠে, কোনো কল্পনাজগতের যদি প্রসার হয়ে থাকে, সেও তো একরকম সমাজেরই কাজ, সামাজিক মননকে উদ্‌বোধিত করে তুলবারই কাজ। তাছাড়া, কে যে কীভাবে সমাজের দায় পালন করেন কবিতার ভিতরে, বহিরঙ্গে সেটা বোঝাও যায় না সবসময়ে।''[২২]

শঙ্খ ঘোষ স্বাভাবিকভাবে সমাজের কথা ভাবেন এবং সেই ভাবনা বাউণ্ডুলেপনা নয়, সেখানে দায়িত্ব নেবার ইচ্ছে বা প্রবণতা মূল। তাঁর সৃষ্টি জুড়ে দায়িত্ব নেবার ইচ্ছে বিস্তারিত— তবে এই প্রকাশে উপস্থিত নিজের এবং নিজশ্রেণীর সমালোচনা, ব্যঙ্গ এবং বেদনা। বিশ্বাস করেন সেই হাতের উপরে হাত রাখার, দীর্ঘতর থেকে দীর্ঘতম পথ পাড়ি দেবার— সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অস্তিত্বের প্রকৃত অবস্থায় আসীন হবার।

''কখনো মনে হয় তুমি ধানখেতে ঢেউ, তারই সুগন্ধে গভীর তোমার উদাত্ত-অনুদাত্তে বাঁধা দেহ, প্রসারি, হিল্লোলিত

আমি ডুবে যাই নিবিড়ে নিমগ্ন বৃষ্টিরেণুর মতো, শিউরে ওঠে সমস্ত পর্ণকণা জীবনের রোমাঞ্চে, ধূপের ধোঁয়ার মতো মাটির শরীর জাগে কুণ্ডলিত কুয়াশায়

তারই কেন্দ্রে তুমি, তুমি প্রসারিত, হিল্লোলিত, প্রসারিত।

আজ মনে হয় কী ক্ষমাহীন রাতগুলি বেঁধেছিলে আমায়। বাইরে তার সজল মেঘাবরণ,
দেখে ভুললে, ভুলে কামনার দুই ঠোঁটে টেনে নিলে বুকের উপর বারে-বারে, ঘুলিয়ে
উঠল অন্তরাত্মা।

কিন্তু কাছে এসে দেখলে, হায়, এ কী ভগ্নকরুণ অবনত দয়িত আমার। এই কি সে
দিব্যসজল মুখশ্রীর যৌবন যাকে আমি মগ্ন আকাশের অসংখ্য তারার মতো চুম্বনকণিকায়
ভরে দিতে পারতুম, হায়

ব'লে উদ্‌বেল হলো করুণা তোমার দুই বুকে, যুগল নিশ্বাস প্রবাহিত হলো ধানখেতের
উপর তোমারই সংহত শরীরের মতো, দূরে

আর তার নিপীড়ন দেহ ভরে আস্বাদ করে আস্তে-আস্তে উন্মোচিত হতে থাকে আমার
সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত অন্ধকার।''[২৩]

নাগরিক কলকাতার নাগরিক-মধ্যবিত্ত অপমানে লেখা হয় 'ভিড়', নাগরিক কলকাতার হৃদয়হীনতায় 'বাস্তু', দেশের এ-প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের যোগহীনতায় 'আরুণি উদ্দালক', সেই-বাংলা থেকে এই-বাংলা— পরিচয়, গন্তব্য প্রশ্নে 'জাবাল সত্যকাম' আবার কলকাতার 'বাবু' মানুষসকল দ্বারা সাধারণ খেটে খাওয়া ড্রাইভারের অপমানিত মুখ— 'নির্বাক মুখ আর সবাক চোখ'কথা।

''গড়ে তুলবার দিকে মন দেওয়া হয়নি আর কী
সহজেই বাঁধ ভেঙে যায়
চেতাবনি ছিল ঠিক, তুমি-আমি লক্ষই করিনি
কার ছিল কতখানি দায়
আমরা সময় বুঝে ঝোপে ঝোপে সরে গেছি শৃগালের মতো
আত্মপতনের বীজ লক্ষই করিনি
আমার চোখের দিকে যে ভিখারি হেসে যায় আমি আজ তার কাছে ঋণী
এত দ্বিধা কেন বলে লাঞ্ছনা করেছে যারা তাদের সবার কাছে ঋণী
এত দ্বিধা কেন বলে লাঞ্ছনা করেছে যারা তাদের সবার কাছে ঋণ
অবনত দিন,
ভাবে, একা বাঁধ দেবে, তা কি কখনোই হতে পারে?
আমাদের বিশ্বাস ঘটে না

আমাদের ঘরে ঘরে প্রতি পায়ে জমে ওঠে পলি

...

কেবল অম্বার কণ্ঠ এখনও নদীর জলে 'সুমন, সুমন'

আর আমি বলে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও

স্পষ্ট হও, বাঁচো—

শুধু মূর্খ অভিমানে বসে থেকে জলস্রোতে কখন যে আরুণি সুমন

তৃষ্ণা দেবতার মূলে একাকার হয়ে যায় তা আমার বোধেও ছিল না।''[২৪]

স্বীকারোক্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে, শঙ্খ ঘোষের কবিতার জিজ্ঞাসা-ক্ষোভ-বিদ্রুপ-বেদনা-সন্ধান। কবির স্বর প্রশ্ন এবং প্রশ্নবাণে বিস্তারিত; কিন্তু তাঁর মন সামাজিক বৈপরীত্য ও অসংলগ্নতার বেদনায় ভারাক্রান্ত। তাঁর না-বোঝা আছে এবং এই না-বোঝার সঙ্গে আছে বোঝার আগ্রহ, জানার— প্রকাশের। তাঁর অনুভব—

''তোমরা এসেছ তাই তোমাদের বলি

এখনও সময় হয়নি।

একবার এর মুখে একবার অন্যমুখে তাকাবার এইসব প্রহসন

আমার ভালো লাগে না।

যেখানে আমার কবর হবে আজ সেখানে জল দিতে ভুলে গিয়েছি

যেসব শামুক তোমরা রেখে গিয়েছিলে

তার মধ্যে গাঢ় শঙ্খ কোথাও ছিল না

তোমরা এসেছ, তোমাদের বলি

গ্রহে-গ্রহে টানা আছে সময়বিহীন স্তব্ধ জাল

আমি চাই আরো কিছু নিজস্বতা অজ্ঞাত সময়।''[২৫]

শঙ্খ ঘোষ কবিতাকে ভেঙে, গড়ে আবার ভেঙে সমাজ দেশ কালকে— জীবন যন্ত্রণাকে দৃঢ়-আপোসহীনভাবে শব্দের অস্থিমজ্জার ভেতর গেঁথে দিয়েছেন। তাঁর কাব্যবোধ কাব্যচর্চার সূচনালগ্ন থেকেই তিনি জীবন-সংলগ্ন— রক্তমাংসের বাস্তবকে ছুঁয়ে মানবিক প্রত্যয়ে অটল। তিনি মনে করেন 'কবির হেরে যাওয়া সাজে না'। কিন্তু তিনি এও জানেন— রেখে যাওয়া 'শামুক'সমূহে 'তার মধ্যে গাঢ় কোনো শঙ্খ কোথাও ছিল না'।

''একদিন সে এসে পড়েছিল এই ভুল মানুষের অরণ্যে। হাতে তাদের গা ছুঁতে গিয়ে কর্কশ বল্কল লাগে বারে-বারে।

আজ মনে হয় কেন সে গিয়েছিল। সে কি ভেবেছিল তার চিকন মোহ উদ্ভিন্ন করে

দেবে অন্ধকারের শরীর? সে কি যেন মেঘলা জল কালো বনের মাথায়? প্রতিটি পাতা তার নন্দন বরণ করে নেবে সবুজ কৃতজ্ঞতায়? আঙুরের আভার মতো দৃষ্টি-ধুয়ে-দেওয়া প্রান্তবেলা?

আজ মনে হয় কেন সে ভেবেছিল। সেই অরণ্যের মধ্যে সেও এক তামসী বৃক্ষ যে নয়, এই কি তার জীবন?

জরাজটিল অরণ্যে তার ঠাঁই হলো না, ঠাঁই হলো না ভালোবাসার আকাশে। সে নেমে থাকল মধ্যপথের অজস্র শূন্যের মাঝখানে। নিঃসীম নিঃসঙ্গ শূন্যে কেঁপে উঠল হৃদয়, ভয়ে জমজম করতে থাকল তার রাত্রির মতো হৃদয়।

আর এই রাত্রি দুলছে নিঃশব্দ বাদুড়ের মতো তাকে ঘিরে। চোখে পড়ে তারই নিরন্ত কালোয় অন্ধ অরণ্যের মূঢ় গর্জন, 'তাকে ঢেকে দাও' 'তাকে ঢেকে দাও' রব করতে-করতে ছিটকে বেড়ালো এধার থেকে ওধার, খসে-পড়া নক্ষত্র বেজে রইল বুকের মাঝখানে, 'তাকে চোখ দাও' 'তাকে চোখ দাও' বলতে-বলতে সীমানাহীন ভয়ে তার চোখ ঢাকল দু-হাতে।

আজ তুমি, যে-তুমি অপমান আর বর্জনের নিত্য পাওয়া নিয়ে তবুও মুঠোয় ধরেছ আমাকে, আমাকেই, আমাকে

সেই তুমি আমার অন্ধ দু-চোখ খুলে দাও, যেন সইতে পারি এই পৃথুলা পৃথিবী, এই বিপুলা পৃথিবী, বিপুলা পৃথিবী...''[২৬]

'এই বিপুলা পৃথিবী, বিপুলা পৃথিবী'— 'পৃথুলা' পৃথিবীতে 'নিষাদেরা জেগেছে সমাজে', মানুষের ছিন্ন ছিন্ন বেঁচে থাকা, অপমানিত বেঁচে থাকা, বড়ো বেশি খণ্ডিত বেঁচে থাকা— দল নিশান ভোট দিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকা! অথচ ভোট দিয়ে, জন-মতামতের রায় পেয়েও অনির্বাণ আলো অদেখাই রয়ে গেছে। মাঠে ময়দানে সভা সমিতিতে কথা বলে সমস্ত অন্ধকার যারা শুষে নেবে বলে কথা দেয়— সেইসব মুখ— বাচাল চতুর শাসক-নেতারা জীবন নিয়ে কেবলই পাশা খেলে, নতুন-নতুন অভিসন্ধি এবং হাততালি পাওয়ার স্বার্থে আত্মসর্বস্ব ভ্রান্ত পথ অভ্রান্ত লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। আর মানুষসাধারণ নকল দেবতার পূজা দিয়েছে, কাজ করেছে, ভোট দিয়েছে, পার্টি-মিছিলে হেঁটেছে, বিশ্বাস রেখেছে— কিন্তু খাদ্যের প্রয়োজনে খাদ্য পায়নি, দেশের প্রয়োজনে দেশছাড়া

হয়েছে, শাসকের সামনে প্রাণ দিয়েছে, ফসল ফলিয়েছে অথচ গ্রাসাচ্ছাদন পায়নি, নদী পারাপারের কাণ্ডারী হয়েও নিজেরাই বন্যায় ভেসে গেছে, নিজের ভাষায় কথা বলতে গিয়ে অপমানিত হয়েছে— কোথাও কোন আশ্রয় পায়নি! বাঁচার পথ! এই নির্মম-নিষ্ঠুর মৃত্যুময় আবহাওয়ায় শঙ্খ ঘোষের কবিতা সকালের আলোর মতো নির্মল, দুপুরে গাছের ছায়ার মতো আশ্রয়স্থল; বিকেলে আরও নিগূঢ় ধ্যানময়। ভালোবাসার। তবে, এই না-ছোড় জীবন-ভালোবাসার কেন্দ্রে কোন বাদ-প্রতিবাদ নয়, আছে কেবল প্রেম ও সততার পথ, শ্রীজ্ঞানের পথ, প্রজ্ঞা পারমিতার পথ, বুদ্ধের পথ, রবীন্দ্রনাথের পথ।

> ''এ প্রত্যয়কে বাঁচিয়ে রাখার কাজে কিছুটা সাহায্য পাওয়া যায় ইতিহাসের বোধ থেকে। দেশবিদেশের নানাযুগের শিল্পসংস্কৃতির ইতিহাসে তো আমরা দেখতে পাই : প্রতিবেশের কাছে কত প্রতিঘাত, পরিচিতের কাছে কত অবমাননা, ইতরের কাছে কত লাঞ্ছনা পেতে পেতে জীবন কেটেছে এক-একজন শিল্পীর, কবির। কিন্তু দমে যাননি তাঁরা। শিল্পের প্রতি বিশ্বাসের একটা সাহস তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এই বিশ্বাসটাই হলো শক্তি। এতজনে যদি পেরে থাকেন, তবে তাঁদের সেই দৃষ্টান্তই তো আমাদের সাহসের উৎস হয়ে বেঁচে থাকতে পারে অহরহ— এইরকম ভাবি।
>
> ভাবি, তবে সব সময়ে যে সেই প্রত্যয়কে নিজেও আমি বাঁচিয়ে রাখেতে পারি তা বলব না! হেরে যাই যখন, তখনই তো নিজের কাছে ও-রকম কথা উচ্চারণ করতে হয় বারবার।...
>
> না, এর পেছনে কোনো মার্ক্সীয় প্রভাব নেই। কেননা মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিন্দুবিসর্গ জানবার আগে থেকেই মানুষ বিষয়ে ভালোবাসার অনুভূতি আমার আকৈশোর সম্বল। সবাই যদি ভালো থাকে, ভালোভাবে বাঁচে, সবাই যদি ভালো হয় আর ভালোবাসে, তবে তার চেয়ে ভালো আর কিছু নেই পৃথিবীতে— এই ছেলেমানুষি জপটা অল্পবয়স থেকেই আমার সবসময়ের সঙ্গী।''[২৭]

তিনি লেখেন—

> ''আজ আর কোনো সময় নেই এই সমস্ত কথাই লিখে রাখতে হবে এই সমস্ত কথাই
> যে নিঃশব্দ সৈকতে রাত তিনটের বালির ঝড় চাঁদের দিকে উড়তে উড়তে
> হাহাকারের রুপোলি পরতে পরতে খুলে যেতে দেয় সব অবৈধতা আর সব
> হাড়পাঁজরের শাদাধুলো অবাধে ঘুরতে থাকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে শুধু একবার
> একবারই ছুঁতে চায় ব'লে।
>
> আর নীচে দুইপাশে কেয়াগাছ রেখে ভিতরের সরু পথ যেমন গিয়েছে চলে অজানা

অটুট কোনো মসৃণ গ্রামের মুখে এখনও যে তা ঠিক তেমনই অক্ষত আছে সেকথা বলাও শক্ত তবু এই সজল গহ্বর এই সর্বস্ব মাতন নিয়ে এ রাতের সমুদ্রবিস্তার তার স্তনন শোনায় যতদূর,

সে-পর্যন্ত জেগো না ঘুমন্ত জন ঘুমাও ঘুমাও ওই গ্রামের উপরে উড়ে পড়ুক নিঃশব্দ সব বালি আর তোমাকেও অতর্কিতে তুলে নিক নিঃসময় কোলে নিক অন্ধকারে কিংবা আলো-আঁধারের জলসীমানায় নিক পদ্মের কোমলভেদে মৃত্যু এসে দাঁড়াক জন্মের ঠোঁট ছুঁয়ে।

আজ আর সময় নেই সমস্ত কথাই আজ লিখে রাখতে হবে এই সমস্ত কথাই এই সমস্ত কথাই।''[২৮]

স্বাধীনতার পরবর্তীতে উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকট— আবার খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯), অসংখ্য শ্রমিক ধর্মঘট, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৬৪), বাঙালী-পাঞ্জাবী সংঘর্ষ (১৯৬৫), তরাই অঞ্চলের নকশালবাড়িতে গ্রামের জোতদারদের একচেটিয়া মালিকানার বিরুদ্ধে আন্দোলন— নকশালবাড়ি আন্দোলন (১৯৬৭)-এর সূত্রপাত। অন্যদিকে উত্তর সীমান্তে ভারত-চীন সংঘর্ষ এবং চীনের একতরফা যুদ্ধবিরতি (১৯৬৫ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)— এই যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরতির মধ্যেই ভারতবর্ষে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন এবং নকশালবাড়ি আন্দোলনের শ্রমিকদের জোতদার খতম, আন্দোলনকারীদের উপরে পুলিশি অত্যাচার— হত্যা এবং হত্যা! বিশ্ব তখন নানা কারণে অস্থির— ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ, চে-গেভারার মৃত্যু— চাঁদে মানুষের প্রথম পদার্পণ! ভারতবর্ষ—

''Of the two process to which the concepts refer, Sanskrization seems to have occured throughout Indian history and still continues to occur. Westernization, on the other hand, refers to changes introduced into Indian Society during British rule and which continue, in some cases with added momentum, in independent India. Westernization, unlike Sanskrization, is not confined to any particular section of the Indian population and its importance, both in the number of people it effects and the ways in which it affects them, is steadily increasing. The achivment of independence has in some ways quickened the process of Westernization, and it is not unlikely that independence was a

necessary precondition of such acceleration. The complex and intricate interrelation between Sanskritization and Westernization."[২৯]

অপরদিকে শিল্প-সাহিত্যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন (এপ্রিল, ১৯৬২) শ্রুতি আন্দোলন (এপ্রিল, ১৯৬৪) ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন (১৯৬৬) সহ—

> ''আসলে ১৯৬০-এর দশকের সংকটই আধুনিকবাদ, আধুনিকতা সম্পর্কে তীব্র সংশয় ও প্রতিবাদকে নিয়ে আসে, ৬৮-র প্রায় ইয়োরোপব্যাপী আন্দোলন, সংঘাত ও তার ব্যর্থতায় পোস্টমর্ডান ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। ফুকো, দেরিদা, লিওতার, বার্ত-এর মতো পোস্টস্ট্রাকচারালিস্টরা এর ক্ষেত্র তৈরি করেন— তাঁরা Signified-এর আগে Signifer-কে স্থান দেন। ফলে ভাষার এক গতিময় উৎপাদনশীলতা, অর্থের অস্থিতিশীলতা, প্রচলিত অর্থের কাঠামো ভেঙে যাওয়ার ওপর জোর পড়ে। দেরিদা বলেন, 'The meaning is infinite implication, the indenfinite referrant of signifire to signified... it always signifies and differs.' এই Signification আরোপিত যে-কোনো কাঠামোগত বাধা ও অবরোধকে প্রতিহত করে। দেরিদা একে বলেন 'dissemination'। একই জিনিস লক্ষ করা যায় দ্যোলুজ-এর বাসনা বা ইচ্ছার ধারণায়, লিওতার-এর 'intensities'- তত্ত্বে, ফুকোর ক্ষমতা বা শক্তির ধারণায়, বোদ্রিআর-এর 'Semiurgy' ভাবনায়। এ সূত্রেই দর্শনের জ্ঞানভিত্তি পাবার অসার কল্পনাকে আক্রমণ করা হয় : নীৎসে , হাইডেগার, হ্বিটগেনস্টেইন, এঁরা এঁদের পূর্বসূরী। বিশেষত নীৎসের সত্য, কার্যকারণ, মূল্যবোধ, ইত্যাদিকে আক্রমণ নতুন অর্থে প্রভাবশালী হয় : অবজেকটিভ ট্রুথ কিছু নেই— বুদ্ধি বা যুক্তির ভানকে নীৎসে আক্রমণ করেছেন। সামগ্রিকভাবে মানবিকবাদী, যুক্তিবাদী বুদ্ধিবিভাসা বা এনলাইটেনমেন্ট আক্রান্ত হয়। ফুকো মানুষের মৃত্যু ঘোষণা করেন। জাঁ বোদ্রিআর সাইনের সতত দ্রুত বংশবৃদ্ধি যে simulaitons-এর সৃষ্টি করে ও নতুন সমাজ অভিজ্ঞতামন্ময়তা নিয়ে আসে তার কথা বলেন না। লিওতার পোস্টমডার্ন পরিস্থিতিকে দেখান যখন গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভ ও আধুনিকতার আশা শেষ। ইতিহাসেরও অবলুপ্তি। মানুষ ইতিহাস থেকে পোস্ট-ঐতিহাসিক, ইতিহাসের ও উদ্ভাবন-পরিবর্তন-প্রগতিবিকাশের এক প্রক্রিয়া। বিপ্লব-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-এর সঙ্গে ছিল। এসব অবসিত এখন ইতিহাস একটা খেলনা, এক বিশেষ effect হিসেবে simulation।''[৩০]

দ্বন্দ্ব-বহুল সময়ের পূর্ববর্তীতে অর্থাৎ উদবাস্তু সমস্যা, খাদ্য-বাসস্থানের হাহাকারময়তা, ভয়-ভয়াবহতা, আশ্রয়হীনতা-অনিশ্চয়তা-বিশ্বাসহীনতার সময়েই উচ্চারিত হয়েছিল—

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC

REPUBLIC and to secure to all its citizens :

JUSTICE : Social, economic and political;

LIBERTY of thought expression, belief, faith and worship; and to pro mote among them all.

FRATERNITY assuring the dignity of the individual the unity and intergrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty six day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION,"[৩১]

অথচ সবটাই যেন 'অয়েল পেন্টিং' স্বাধীনতার পরেও পরাধীনতা অর্থাৎ অপমান নিয়ে বেঁচে থাকা— শোকে আর সন্তাপে। অন্যের দিকে তর্জনী তুলে তুলে সবকিছু সরগরম করে বেঁচে থাকা! স্বাধীনতা হয়ে থাকল—

''স্বাধীনতা' শব্দের অর্থ দেশবাসীর কাছে নানাভাবে হাজির হল। 'স্বাধীনতা' শব্দের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বুঝতে পারল না। তাদের বলা হল, ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তাদের চলে যেতে বাধ্য করেছে দেশের মানুষ। তারা এখন দেশ চালাবে। তাই শুনে কেউ খুশি হল, ভয়ে শুকিয়ে গেল কারও মুখ, দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে হায় হায় করল অনেকে। জনসমাজের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, নাগরিক, আধানাগরিক, মফস্বলী বড়ো অংশ হৈ হৈ করে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করল। স্বাধীনতা বলতে তারা বুঝল, সুসজ্জিত সভা, ভাষণ, জলসা, আনন্দোৎসব, বাড়ির ছাদে পতাকা ওড়ানো। দেশবিভাগের অভিশাপ জর্জরিত কোটি কোটি নিরাশ্রয় মানুষের কাছে স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়াল, পরিচয়হীনতা কাটাতে তারা যে নতুন আত্মপরিচয় তৈরি করল, তার নাম 'রিফিউজি কালচার'— উদ্বাস্তু সংস্কৃতি। নতুন সংস্কৃতির মূল কথা, জোর যার মুলুক তার। আত্মরক্ষার জন্যে জীবনাচরণ বদলাতে তারা বাধ্য হল। স্বাধীনতার আর একটা অর্থ পাওয়া গেল, স্বেচ্ছাচার। স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করার অধিকার। স্বাধীনতা হয়ে দাঁড়াল 'আমার স্বাধীনতা', 'আমার পরিবারের স্বাধীনতা'। স্বেচ্ছাচারী এই মনোভাব, সমাজ কাঠামোর প্রতি কোশে, গ্রন্থিতে ছুঁচের মতো বিঁধতে থাকল। রাস্তার যত্রতত্র পেচ্ছাব করার অধিকার যেমন স্বাধীনতা, তেমনই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীর অসুবিধের কথা না ভেবে তারস্বরে চেঁচানোও স্বাধীনতা। কাজ করাটা যেমন স্বাধীনতা, কাজ না

করা, অকাজ-কুকাজ করাও স্বাধীনতা। 'তলানী বা 'আণ্ডারক্লাস' শব্দটি সমাজ বিজ্ঞানে ঢুকে পড়ল। তলানি জনগোষ্ঠী, তলানী মানসিকতা, মনস্তত্ত্ব সমাজ কাঠামোর বড়ো অংশে ছড়িয়ে গেল। স্বাধীনতার কবচকুণ্ডল, যার নাম শৃঙ্খলা, সংযম, আত্মবিকাশের গভীর অনুভূতি, স্বাধীনতার শরীর থেকে কেটে বাদ দেওয়া হল। জনজীবনের তলানি কর্মসূচিকে আস্কারা দিয়ে নিরাপদ করল সংগঠিত তলানি রাজনীতি।''[৩২]

—এই ভয়াল-জটিল ক্ষত-ক্লান্তি-নৈরাশ্যময়, আত্মসচেতনতাহীন বিপুল আত্মভোগ— ভুল ভুল ভুলভাবে বেঁচে থাকার অপার হতশ্রী সময়ে শঙ্খ ঘোষ পরম ভালোবাসা-বিশ্বাস-আত্মসমালোচনা-বেদনায় লেখেন জীবনের কথা। সমাজ দেশ কাল— সমগ্রের কথা। কালের কথা কালাতীতে। 'তিমরে বিষয়ে দু-টুকরো'—

''ময়দান ভারী হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।''[৩৩]

লেখা হয় 'ভিখিরি ছেলের অভিমান'—

''আগে বলবেন, গা রে খোকা
পরে বলবেন, মাপ করো
সামনে থেকে যা সরে যা
নামার পথটা সাফ করো

গাব না তাই গান

আগে বলবেন, গতর খাটো
পরে মারবেন লাথি
আগে কথার ধুল্ ওড়াবেন
পরে দাঁতকপাটি

গাব না আর গান''[৩৪]

আবার লেখা হয় 'বাবরের প্রার্থনা'—

''এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়।
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা।
...
না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?
...
আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।''[৩৫]

''মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'' (১৯৭৪) কাব্যগ্রন্থের 'তিমির বিষয়ে দু-টুকরো' এবং ''বাবরের প্রার্থনা'' (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থের 'ভিখিরি ছেলের অভিমান' এবং নাম কবিতা। ভিন্ন দুই কাব্যগ্রন্থের ভিন্ন তিন কবিতার 'সূচনাকথা'— 'তিমির বিষয়ে দু-টুকরো', কবিতায় অনিশ্চয়তায় কেঁপে ওঠা দিনগুলিতে যারা মুক্তির কথা ভেবেছিল অথবা নকশালবাড়ির পথ যাদের কাছে মুক্তির পথ বলে মনে হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম একজন তিমির— তিমিরবরণ সিংহ। উজ্জ্বল-মেধাসম্পন্ন স্বপ্নময় তিমির—

''মনে পড়ে তিমিরের কথা, তিমিরবরণ সিংহ।

অনার্স ক্লাসে এসে ভর্তি হলো যখন, তরুণ লাবণ্যময় মুখ, উজ্জ্বল চোখ, নম্র আর লাজুক। অজিত দত্ত একদিন বকেছিলেন বলে সেই অভিমানে ছেড়ে দেবে কলেজ, জলভরা চোখে বলেছিল একদিন, অনেকরকম সান্ত্বনায় তার মন ভোলাতে হয়েছিল তখন। তারপর, প্রায় একবছর বিদেশে কাটাবার পর যখন

ফিরে এসেছি আবার আটঘট্টিতে, তিমিরের মুখের রেখায় অনেক বদল হয়ে গেছে ততদিনে। কেবল তিমিরের নয়, অনেক যুবকেরই তখন পালটে গেছে আদল, অনেকেরই তখন মনে হচ্ছে নকশালবাড়ির পথ দেশের মুক্তির পথ, সে-পথে মেতে উঠেছে অনেকের মতো তিমিরও। ...আমেরিকায় গিয়েছিলাম বলে আমার সঙ্গে তৈরি হয়েছে একটা কৌণিক দূরত্ব। আর্টস-বাড়ি থেকে লাইব্রেরির দিকে যাবার পথে দেখতে পাই মাঠের মধ্যে বসে দু-চারজন সমবয়সীর সঙ্গে কথা বলছে সে, ইচ্ছে করেই আমাকে লক্ষ করতেচায় না, কিন্তু চোখমুখ থেকে বুঝতে পারি নিছক আড্ডা নয় ওই বৈঠকে, গূঢ়তর ভাবনা আর স্বপ্নের একটা আলো ছড়িয়ে আছে মুখে।

ওদের বি.এ. পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, এর কিছুদিন পর। কলেজের ঘরে বসে আছি, হঠাৎ এসে ঢুকল তিমির। একটি কাগজ হাতে তুলে দিয়ে জানতে চাইল : 'এ বইগুলির কোনোটা কি আছে আপনার কাছে?' কাগজটাতে ছিল লম্বা এক নামের ফর্দ, নানারকম বইয়ের নাম, ইংরেজিতে বা বাংলায়, সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের রাজনীতির অর্থনীতির বই। নামগুলির নির্বাচন তাৎপর্যহীন নয়, বুঝতে পারি তার অভিপ্রায়।...

তারপর একদিন গ্রামে চলে গেছে সে। এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রাম, কোথায় কখন তার কোনো খবর জানিনি আমরা। বিশেষ থেকে নির্বিশেষ হয়ে গেছে একদিন, আরো অনেক চেনা-অচেনা ছেলের মতো। মাঝেমাঝে উড়ো খবর শুনতে পাই; শুনতে পাই সংগঠনে সে খুব জোরালো আর জনপ্রিয়, আর পুলিশও তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে চারদিকে। শুনতে পাই, নানা ছদ্মসাজে পুলিশের চোখ এড়িয়ে কাজ করে চলেছে সে। কিন্তু ধরাও পড়ে একদিন। আর তারপর, আবার একদিন, কয়েকজন সহবন্দীর সঙ্গে মিলিয়ে তাকে পিটিয়ে মারে পুলিশ— ''[৩৬]

'ভিখিরি ছেলের অভিমান' কবিতাটির 'সূচনাকথা'—

''বিবেকানন্দ রোড আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর মোড়টা পেরিয়ে এসেছে উত্তর-মুখী বাস, দোতলার জানালার ধারে প্রায় সামনের দিকে বসে আছি, উঠে এল ন-দশ বছরের একটি ছেলে। কাঁধ থেকে ছেঁড়া একফালি জামা, ছোট্ট একটা মাটির হাঁড়ি হাতে। সমস্ত সিট ট্পকে একেবার সামনে এসে বসে পড়ল নীচে, সবার মুখোমুখি। হাঁড়িটা উলটে নিয়ে টপাটপ বাজাতে বাজাতে তার চিকন গলায় শুরু করল গান।

অফিসফিরতি ধ্বস্ত যাত্রীরা চনমন করে উঠলেন সবাই। ভারি সুরেলা

গলা তো! বাঃ, ভারি স্বচ্ছন্দ গান! গাওয়া শেষ হতে হতে আগ্রহে ঝুঁকে পড়েছেন অনেকে, বলছেন : চমৎকার! শিখলি কোথায় রে! গা, আরেকখানা গা'। ছেলেটির খিন্ন মুখে যেন আলো পড়ে একটু, গায় সে আবার। এবারও শেষ হয়ে এলে, আসে আরেকবারের নির্দেশ। যেন কোনো গানের আসরেই বসে আছি আমরা, প্রিয় কোনো শিল্পীকে যেন একটির পর একটি অনুনয় ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, একোণ থেকে ওকোণ থেকে। ছেলেটির ছোঁটে স্নিগ্ধ একটুকরো হাসিই লেগে রইল এবার। গাইল সে আবার।... ছেলেটিরও গান শেষ হলো, উঠেছে সে। একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে হাত বাড়িয়ে এক-পা এক-পা এগিয়ে চলেছ, সে তার পারিশ্রমিক চায় এবার।

আর তখনই ঘটতে থাকে সেই কাণ্ডটা। তারিফ করছিলেন যাঁরা, তাঁরা কেউ কেউ তখন জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরে। পথের আর ভিতরের বহু ধ্বনিপ্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে যাকে সুর পৌঁছে দিতে হচ্ছিল তিন-তিনবার, বহু স্টপ গড়িয়ে এসেছ যে, সে বান্দা অবশ্য নাছোড়। হাত বাড়িয়ে পাশে দাঁড়িয়ে কেবলই বলতে থাকে : বাবু, বাবু—

আর শুনতে থাকে

'বলবেন না আর, ভিখারিতে ভরে গেল দেশটা। সর্ সর্, গায়ের উপর পড়বি নাকি? 'ভিখিরি কী বলছেন! এদের তলে তলে সব বজ্জাতি। কিচ্ছু করবে না, করতে চায় না, ভিখিরি সেজে পয়সার ধান্দা।' 'কী রে ছোকরা ভিক্ষে করিস কেন? খেটে খেতে পারিস না? কাজ দিলে করবি? ঘরের কাজ করবি?' 'দেখুন, কেমন মট্কা মেরে আছে'। ঘরের কাজ করবে কী! ওসব বলবেন না। বেশির ভাগই এরা চোর-বাটপাড়, ভুলেও যেন ঘরে ঢোকাবেন না।'

বাস চলবার তালে তালে দুলতে থাকে কথাগুলি। ছেলেটি একটু একটু করে এগোয়। একবার ডাইনে তাকায়, একবার বাঁয়ে তাকায়। চোখদুটো পালটে যেতে থাকে। গুটিয়ে নেয় হাত। সিঁড়িতে পা দেবার মুখে পিছন ফিরে একবার আলতো স্বরে বলে শুধু : আর গান করব না। সকলের মুখ দেখে নিয়ে নেমে যায় নীচে।

শুধু রেখে যায় তার দৃষ্টি। আমার সঙ্গে কদিন ধরে কেবলই ঘুরতে থাকে সেই দৃষ্টি, আর তার সেই অভিমান, 'আর গান করব না' বলে তার সেই অসহায় প্রতিবাদের নেমে যাওয়া।''[৩৭]

এবং 'বাবরের প্রার্থনা'—

''শেষ হয়ে আসছে ১৯৭৪।

বড়ো মেয়েটি বেশ অসুস্থ তখন, ডাক্তারেরা ভালো ধরতে পারছেন না রোগটা ঠিক কোথায়। শুয়ে আছ অনেকদিন, মুখের লাবণ্য যাচ্ছে মিলিয়ে। অথচ তখন তার ফুটে উঠবার বয়স।

মন্থর হয়ে আছে মনটা।

ঘুরে বেড়াচ্ছি একদিন যাদবপুরের ক্যাম্পাসের মধ্যে, দিনের ক্লাস আর সন্ধার ক্লাসের সন্ধিমুখে মাঝখানে অনিশ্চিত ফাঁকা বিকেল, বন্ধুরা কেউ সঙ্গে নেই সেদিন। পশ্চিম থেকে পুবে, রাস্তার ওপর পায়চারি করতে করতে ঘরের ছবির সঙ্গে মনে ভিড় করে আসে ক্যাম্পাসেরও পুরোনো অনেক ছবি। দু-একটি ছেলেমেয়ে কখনো-কখনো পাশ দিয়ে চলে যায়, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় কদিন আগেও এখানে যত প্রখরতা ঝলসে উঠত নানা সময়ে, তা যেন একটু স্তম্ভিত হয়ে আছে আজ। কেবল যে এখানেই তা তো নয়, গোটা দেশ জুড়েই। সে কি খুব শান্তির সময় ছিল? একেবারেই নয়। সংঘর্ষ অশান্তিতেই বরং ভরে ছিল দিনগুলি। এই পথ ওই মাঠ, এর প্রতিটি বিন্দু তার কোনো-না-কোনো উন্মাদনার চিহ্ন ধরে আছে, ভুলের লাঞ্ছনার আত্মক্ষয়ের, কিন্তু সেইসঙ্গে কিছু স্বপ্নেরও, কিছু জীবনেরও। আজ প্রশমিত হয়ে আছে সব। কিছু-একটা হবার কথা ছিল, অলক্ষ্য কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু হলোনা ঠিক, হয়ে উঠল না।

কিন্তু কেন হলো না? আমরাই কি দায়ী নই? কিছু কি করেছি আমরা? করতে পেরেছি? আমাদের অল্পবয়স থেকে সমস্তটা সময় স্তূপ হয়ে ঘিরে ধরতে থাকে মাথা। ফিরে আসে মেয়ের মুখ। মনে পড়ে আমার নিস্ক্রিয়তার কথা। তাকিয়ে দেখি কলেজপ্রাঙ্গণ, ফাঁকা। হাঁটতে হাঁটতে পুবের শেষ প্রান্তে গিয়ে পশ্চিমমুখে ফিরেছি আবার, চোখ পড়ে আকাশে। সূর্য আড়াল হয়ে যাবে আর অল্প পরেই। হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ তখন মনে হলো মাটির ওপর জানু পেতে বসে পড়ি একবার এই সূর্যের সামনে, কেউ তো নেই কোথাও! যেন সমস্ত শরীর ভরে উদ্‌গত হয়ে উঠতে চায় অতল থেকে কোনো প্রার্থনা, সকলের জন্য। মনে এল নামাজের ছবি। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে এল ইতিহাসের পুরোনো সেই গল্প, রুগ্‌ণ হুমায়ুনকে ঘিরে ঘিরে বাবরের প্রার্থনা। মন্থরতার ভিতর থেকে তখন উঠে আসতে চায় কতগুলি শব্দ : এই তো জানু পেতে—, এই তো জানু পেতে—''[৩৮]

'সূচনাকথা' কবিতা-ব্যাখ্যা নয়, 'সূচনাকথা' সমান-সমান 'সূচনাকথা'। 'তিমির বিষয়ে দু-টুকরো', 'ভিখিরি ছেলের অভিমান' এবং 'বাবরের প্রার্থনা'— হৃদয় আর মেধা, জাদু আর বাস্তবতা অথবা

যুক্তি, রহস্য আর স্বচ্ছতা, ক্ষমতা আর ক্ষোভ, নম্রতা আর বিদ্রোহ, আসক্তি আর বিদ্রুপ। প্রতিবাদ আর দুর্বলতা অথবা নিজের নিজ-শ্রেণীর চরিত্রাবস্থা, ব্যক্তি আর সমাজের নানা মুহূর্তের খণ্ডগুলি সম্পৃক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্খ-সমগ্র। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকাংশে বলা 'সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার' এবং 'সমস্তটা মিলিয়ে আদ্যন্ত একটিই-যে নাটক গড়ে উঠবার কথা ছিল'— তা হয়ে উঠেছে 'প্রগল্‌ভতাহীন' সমগ্র— সমাজ দেশ কালের অভিঘাতময় আত্মপরিচয়ের স্বতন্ত্র সমগ্র। তিনি নিজেই নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নেন তিমিরের ছিন্ন শির, ভিখিরি ছেলের দৃষ্টিতে দেখে নেন নিজ-শ্রেণীর মুখ-মুখোশ, বর্বর জয় অর উল্লাস এবং নিস্ক্রিয়তার সঙ্গে প্রার্থনা— এখানেই শঙ্খ ঘোষের অনন্য স্বতন্ত্রতা। কেবলমাত্র আকস্মিক জন্ম অনিবার্য মৃত্যু অমোঘ যৌনতার কথা নয়, এইসব নিত্য সত্য এবং সত্যের উপরে ভর করে যে জীবন চলেছে ভবিষ্যতের দিকে, তাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে আঁকেন। আর তাতে কবির 'আমি' এবং বাইরের 'সমাজ' মুখোমুখি হয়ে তৈরি হয়ে উঠেছে আরেকটি 'তৃতীয় সত্তা'— যাতে অতীত আর ভবিষ্যতের কথা উঠে আসে দেশের সময়ের পথ বেয়ে দেশোত্তর পটভূমিতে। 'ঈশ্বর' এবং 'বাবরের প্রার্থনা' 'নমাজ' এবং 'বাবরের প্রার্থনা'— কবির আকুতি-আত্মসমালোচনা মাত্রাময় রূপ পায়। তবে একথাও স্মরণীয় যে, শঙ্খ ঘোষের কবিতা কেবলমাত্র মানবতা, সমাজ সচেতনতাধর্মী বাণী নয়, পরতে পরতে রয়েছে শিল্পসম্মত আত্মসমালোচনা— নম্রতা, গভীর বেদনা এবং উজ্জ্বল আলোর আকুতি। এই আকুতিতে মিশে আছে ঐতিহ্যের গভীর পাঠ—তা কখনো লোকছড়া-কথা-কাহিনী-স্মৃতি ছন্দ বিজড়িত হয়ে উঠে এসেছে আবার কখনো বা উঠে এসেছে ইতিহাসের সমুজ্জ্বল কোন স্বর-স্বপ্ন-ঘটনা সমকালের নিরিখে, আছে পুরাণকথার নবনির্মাণ।

> ''লোকে বলে আনন্দ থেকে লেখা হয়, লিখে আনন্দ হয়, আমার তো তা মনে হয় না। আমরা খুব যন্ত্রণা হতে থাকে, এতই যে মাঝে মাঝে শরীর ঠিক রাখাই শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।' সত্যিই তাই। সত্যিই তো জীবনের যে পরিচয়টাকে লেখক তাঁর লেখায় ধরতে চান, বলতে চান সেটাকে যখন তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে বোধ করেন, তখনই লেখা সম্ভব। আর, সমস্ত শরীর দিয়ে বোধ করবার একটা যন্ত্রণা তো অবশ্যই আছে। কবিদের, শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনেকসময় বলা হয় সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের মতন, যে যন্ত্র মাটিতে গেঁথে দিলে তার সামান্যতম কাঁপুনিও ধরা পড়ে। সমাজের চারদিকে যা কিছু চাঞ্চল্য চলছে, সে তো অনেকেই দেখতে পান। কিন্তু আপাত-চাঞ্চল্যটুকু নয়, ভিতরের অনেক না-জানা সংকট, প্রতিমুহূর্তের একটা ধ্বংসকাজ তৈরি হচ্ছে গোপনে, সেগুলিও দেখতে পান একজন কবি, দেখতে হয় তাঁকে। এটুকু দেখতে দেখতে, এসব সহ্য করতে করতে কারো মনে হতে পারে :

এ এক অসহ্য ব্যাপার। মনে হতে পারে, অসহ্য এই সমাজটায় থাকা, যে-সমাজে আমরা আছি : চারদিকে এত মিথ্যে, এত চাতুরী! সরিয়ে দেবার একটা দায় আছে।''[৩৯]

ব্যক্তিগত দায় কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক নয়, চারপাশটাকে দেখেন নিজের কাছে কোনরকম ফাঁকি না রেখে। 'নতুন কিছু' বা 'পুরনো মতো কিছু' কবিতা ভাবনাতে তাঁর অনীহা, অবিশ্বাস— তিনি বিশ্বাস করেন মূলে, ঘর-বাহির সবটা মিলে। কেবল বাইরের বদল বা পরিবর্তনে নয়, তাই লেখা হয়— 'তিমির বিষয়ে দু-টুকরো', 'ভিখিরি ছেলের অভিমান', 'বাবরের প্রার্থনা'-এর মতো কবিতাবলী। তিনি 'কৃত্তিবাস', 'শতভিষা', 'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'দেশ', 'আজকাল', 'প্রতিক্ষণ'— সে-ভাবে কোন পত্রিকারই নন, যেমন নন তথাকথিত কোন ছককথা— দলের। দেশের খাদ্য আন্দোলনে হৃদয়বান, বন্যায় ত্রাণ সংগ্রহকারী, নকশাল আন্দোলনে পুলিশের তথা রাষ্ট্রের ভূমিকায় হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েন অত্যাচার-অনাচারের নিষ্ঠুরতার ধরণ দেখে, দেশের সংযোগহীনতায় দুঃখিত এবং আত্মসমালোচক— ডান বা বাঁ-দিক নয়, তাঁর দৃষ্টি শান্তিকামী পায়রার মতো সমান আলোময়— স্বাধীনতার কুড়ি পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরেও।

> ''২০০২ সালে গুজরাত-গণহত্যার পরে কলকাতায় লেখক-শিল্পীদের মিছিলে, ২০০৭ সালে নন্দীগ্রাম-গণহত্যার পরে বামফ্রন্ট-সরকারবিরোধী ঐতিহাসিক নাগরিক-মিছিলে, ২০১৩ সালে কামদুনি-গণধর্ষণের প্রতিবাদে তৃণমূল সরকারবিরোধী মিছিলে যোগ দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। ২০১৬ সালে বিধানসভা-নির্বাচনের আগে রাজ্যের হিংসা-আবহের প্রতিবাদে বাম-কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে গিয়েছিলেন স্মারকলিপি দিতে।''[৪০]

শঙ্খ ঘোষ এমন একজন কবি যিনি মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন অর্থাৎ নিজের প্রতিধ্বনি হতে দেননি কখনো— প্রতি মুহূর্তে লিখে গেছেন পরিশোধিত পূর্ণায়তর কবিসত্তা নিয়ে। তাতে ইতিহাস চেতনা অভিজ্ঞতার কালক্রমিক, আত্মমগ্নতা এবং বহির্মুখিতা পারস্পরিকতায় যুক্ত হয়ে ভালোবাসার মিনার গঠন করেছেন। কেবল সমস্যার বিস্তার নয়, ভালোবাসার-আলো বিস্তারিত মূহূর্তে-মুহূর্তে।

> ''না আর হ্যাঁ, ভিতর আর বাহির, নিঃশব্দ আর শব্দ, গতি আর যতি, কবিতার তুমি আর আমি— এরকম যেসব জোড় আসে শঙ্খ ঘোষের লেখায় তাদের প্রতিটির মধ্যে আছে বৈপরীত্য, আবার যোগও। দ্বন্দ্বমূলক এই সম্পর্কগুলির কোনো কোনো সম্পর্ক থেকে আসে তৃতীয় অবস্থান, কোনোটি থেকে ঘটে এক তৃতীয় সত্তার দিকে আবর্তন, তার পর আবার শুরু হয় ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, এবং নিরন্তর চলতে থাকে এই প্রক্রিয়া। এই ভাবেই হতে থাকে প্রসৃতি। না আর হ্যাঁ সম্পর্কে এই কবি 'জার্নাল-এ লেখেন : এক মুহূর্তের হ্যাঁ বিপরীতের আঘাতে

ভেঙে পড়ে যায়, না-এর পর না আসে, তার থেকে জেগে-ওঠা হ্যাঁ বলে যাকে ভাবি তাকেই আবার ভাঙতে থাকি পরের মুহূর্তে আরেকরকম না-এর আঘাতে...।' আবার, কবিতার তুমি আর আমি সম্পর্কে বলেন: 'আমাদের অস্তিত্ব এমনিতেই নানাখানা হয়ে আছে এবং তার একটা দিক বাইরে মুখফেরানো, অন্য দিক ধরা আছে কেন্দ্রে। এ দুয়ের মধ্যে সর্বায়ত সংগতি যতই ছিন্ন হতে থাকে, কবিতা ততই হয়ে ওঠে বেদনারক্তিম, ততই টান-টান চেতনা ধরা পড়তে থাকে এই দুই বিপরীতের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এরই একটা দিক কবির আমি, অন্য দিক কবির তুমি।... এই দুইয়ের মধ্যে যাওয়া-আসাতেই কবি প্রতি মুহূর্তে অর্জন করে নিচ্ছেন এক তৃতীয় সত্তা, এবং তার পর আবার শুরু হচ্ছে নাটক' (কবিতার তুমি : নিঃশব্দের তর্জনী)। এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় কবির এই বক্তব্য যে কবির আমি আর তাঁর বাইরের সমাজের মধ্যে চলে অবিরাম সংঘর্ষ, যে সংঘর্ষ থেকে কেবলই উন্মেষ হয় তৃতীয় একটি সত্তার। নিরন্তর এই সংঘর্ষ আর তৃতীয় এক সত্তার দিকে আবর্তনের এই পথ যেমন আত্মনির্মাণের, কবির হয়ে ওঠার, তেমনই ভালোবাসার।''[৪১]

সাতের দশক— সমাজের মানবিক দ্বন্দ্ব, বিকার ভাবালুতা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, আন্দোলন— রাষ্ট্রপতি শাসন জারি, দমন-পীড়ন, উত্থান-পতন, রাজনৈতিক ছক— ছকের বাইরে ভেতরে টানাপোড়েন, অর্থনৈতিক অবস্থার ভয়াবহ অবক্ষয় এবং বিকাশ— 'সবুজ বিপ্লব'। সাতের দশক সর্বাপেক্ষা পরস্পর বিপরীত—

''সত্তর দশক ছিল একটা ভয়ার্ত কঙ্কাল সময়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস-সংশয় সব নিয়ে শুরু থেকে কবিদের হাঁটতে হয়েছে ভয়ংকর আগুনের মধ্যে দিয়ে। নকশাল আন্দোলনের সর্বগ্রাসী সংক্রামক কবিতার উপাদান হিসেবে সকলেই যে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁদের পরিবেশনে, তা হয়তো নয়, কিন্তু সময়ের একটা উত্তাল অভিঘাত টের পাওয়া গিয়েছিল তাদের অনেকের মধ্যেই, অল্পবিস্তর। ধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল মূল্যবোধ, ভেঙে পড়ছিল বানিয়ে-তোলা যাবতীয় নির্মাণসুষমা, মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল আত্মসন্দেহ, অনিশ্চিতি, সত্যভঙ্গ আর বিশ্বাসঘাতকতা।''[৪২]

—এই সংগ্রামকালে, বিপ্লবের অনুকূল আবহাওয়ায়— জীবন কাতরতা, অস্তিত্বের বিপর্যয় অবস্থা, আন্দোলন, মৃত্যু, ঘাত-আঘাতের পূর্বে কবি শঙ্খ ঘোষ 'একদিন সে এসে পড়েছিল এই ভূল মানুষের অরণ্যে। হাতে তাদের গা ছুঁতে গিয়ে কর্কশ বল্কল' বার বার অনুভব করেছিলেন—

''এর কোনো মানে নেই! একদিনের পর দু-দিন, দু-দিনের পর তিনদিন
কিন্তু তারপর কী?

একজনের পর দু-জন, সুজনের পর দুর্জন
কিন্তু তারপর কী?
এই মুখ ওই মুখ সব মুখ সমান

তুমি বলেছিলে ঘর হবে, ঘর হলো
তারপর কী?

- তুমি বলেছিলে স্নেহ হবে, স্নেহ হলো
তারপর?
কতদূরে নিতে পারে স্নেহ? অন্ধকারও আমাকে সন্দেহ
করেনি কখনো
বুকে বসে আছে তার এত বড়ো প্রতিস্পর্ধী কোনো!

না-এর পর না, না-এর পর না, না-এর পর না
তারপর কী?
পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা
তারপর?''[৪৩]

অতঃপরেও কবি ভালোবাসার 'অন্ধ দু-চোখ' খোলার প্রার্থনা, করেন 'যেন সইতে পারি এই পৃথুলা পৃথিবী, এই বিপুলা পৃথিবী, বিপুলা পৃথিবী...'। বাচাল সময়ে, 'শব্দের প্রকৃত বোধ' লুপ্তকালে চিৎকারে-চিৎকারে দীর্ণ-জীর্ণ সময়ে মাতাল অথবা প্রৌঢ় হতে চান— না হলে যুক্ত সত্তার ভার বইতে পারবেন না, 'সত্যি'র প্রকাশ অসম্ভাব্য হয়ে উঠবে ভালোবাসা আর সত্যি বলার সময়ে ভাষা চাই —শুচি, গম্ভীর, নীরব-শুশ্রূষাময় ভাষা! তাঁর আরও কিছু 'অজ্ঞাত সময়' দরকার, আরও কিছু গাঢ় সময়—

''যখন প্রহর শান্ত, মধ্যম, নিবিড় আভাসিনী
সমস্ত ব্যসন কাম উজ্জ্বলতা ঘুমিয়ে পড়েছে
বাহিরে-দুয়ারে চাবি, আমি নতজানু একা
আমার নিজের কাছে ক্ষমা চাই, পরিত্রাণ, প্রতিটি শব্দের শাস্তি—
বধির দিনের যাত্রী :
কর্মে ছিল অধিকার, আমাকে কি সমর্পণ সাজে?''[৪৪]

সমাজ দেশ কাল সচেতন একজন কবির 'সমর্পণ' সাজে না। আর সাজে না বলেই 'জেগে ওঠে

বুদ্ধের দু-চোখ', বেদনাময় ভালোবাসা-নির্মল ভালোবাসা। লেখা হয়— ''তুমি তো তেমন গৌরী নও'' (১৯৭০); লেখা হয় বুকে তোলা পাথরের কথা, সঙ্ঘ ভেঙে যাবার বিকট শব্দ-কথা, বানানো বানানো বানানো— সকল বানানো কথা! আবার তথাকথিত নয়, প্রকৃত সামাজিকের কথা— ''মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'' (১৯৭৪)। অর্থহীনতা নয়, অর্থ— নিজের অর্থ, সমাজ দেশ কালের অর্থ, মানুষের বেঁচে থাকার অর্থ, 'কালযমুনা'। লেখেন 'আয়ু'—

''এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো
শব্দহীন হও
শষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর

লেখো আয়ু লেখো আয়ু

ভেঙে পড়ে ঝাউ, বালির উত্থান, ওড়ে ঝড়
তোমার চোখের নীচে আমার চোখের চরাচর
ওঠে জেগে

স্রোতের ভিতরে ঘূর্ণি, ঘূর্ণির ভিতরে স্তব্ধ
আয়ু
লেখো আয়ু লেখো আয়ু
চুপ করো, শব্দহীন হও।''[৪৫]

তিনি চান 'মিথ্যা শেষ হয়ে যাক, শেষ হোক আলোর চাতুরী', 'বেশি কথা' শেষ হোক— অথচ চারদিকে পিশাচ পোষাক পড়া অগণিত মানুষ, চতুর বাক্যে ভরে আছে কথোপকথন— 'ভয়াবহ শব্দভূমে ভরে গেছে পৌষের বাতাস'! ভয়ঙ্কর সাতের দশক— নকশাল আন্দোলন, দমন-পীড়ন, প্রশাসনের নগ্ন নিষ্ঠুরতা, চোরাগোপ্তা ভ্রাতৃঘাতের, মিসা-গুমখুন-থার্ড ডিগ্রির। এই সময়েই কবি লিখলেন—

''আমি আছি, এই শুধু। আমার কি কথা ছিল কোনো?
যতদূর ফিরে চাই আদি থেকে উপান্ত অবধি
কথা নয়, বাঁচা দিয়ে সমূহ প্রবাহ পাব ব'লে
এই দুই অন্ধ চোখ ভিজিয়ে নিয়েছি অন্ধকারে।''[৪৬]

এই সময় আত্মবিচারের, আত্মসমীক্ষারও— কেননা এই সময়েই পুনরায় মুক্তির কথা ঘোষিত হয়েছিল, শাসক পক্ষ নিজের চোখের দিকেও তাকাতে ভয় পেয়েছিল। আবার সারা পৃথিবী জুড়ে

নানা ভাঙন-গড়ন, বিপ্লব-বিদ্রোহ— এইসবের ভেতরে অক্টাভিও পাজ-এর মন্তব্য—

> "The modern age considers itslelf revolutionary. In many ways it is; the first most obvious is semantic : the modern world has changed the meaning of world revolution. The original meaning— the turning of the worlds and stars— has another, now the more usual, placed beside it : a violent breaking with the old order and the establishment of a new, more just, or more raitonal order the turning of the stars was a visible manifestation of circular time; in its new meaning, revolution became the most perfect expression of sequential, linear, and irrversible time. One implied the eternal return of the past; the other the destruction of the past and the building of the new society. But the first meaning does not disappear completely : it undergoes yet another conversion. In its modern meaning, revolution expresses with maximum coherence and concept of history as inescapable change and progress."[৪৭]

প্রকৃতপ্রস্তাবে, শঙ্খ ঘোষের কবিতা ঘাত-প্রতিঘাতে মৃত্যু-রক্তে সমাজচেতনায় প্রসারিত— প্রেম আসে সমগ্রতায়। তাঁর কবিতা পৌঁছে দিয়েছে বা দেয় এমন এক প্রার্থিত শান্তিতে যেখানে ভাষা অন্তহীন রূপ ধারণ করে— অথচ লিখেছেন নিঃশব্দে, 'দুঃসহ আড়াল থেকে'।"মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়" (১৯৭৪), "বাবরের প্রার্থনা" (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থে ইতিহাসের গভীরতা, বর্তমানের সাধারণ মানুষের জীবনের-ভাষাকে, প্রতিবাদকে সুসংহত ও শান্তভাবে বেদনাময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সেই কবিতা যা সমস্ত আপেক্ষিক বা ক্ষণিকের আলোড়নময় হাওয়া-অঞ্চল পেরিয়ে পৌঁছোয় বিন্দুর মতো কেন্দ্র-সত্যে। কবি তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে লেখেন সেই কবিতা— যেখানে থাকে অগণ্য জীবন, ফুটপাত, দেশভাগ, প্রতিদিনের অপমানিত অসহায় মুখ এবং কবির বোধ ও বেদনা। কবিকে দেখতে হয়েছে স্বভূমির সমাজ, শাসনতন্ত্র এবং জনগণের দিনযাপনের পরিস্থিতি— দেশের প্রশাসন, প্রশাসনের ক্ষমতায়ন, সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া— বিশেষত তরুণদের উদ্দীপনা, প্রতিবাদ এবং 'অনেক তরুণ তিলে তিলে নিজেদের ধ্বংস করবার আয়োজন করেন সবাই, মেতে ওঠেন এক আত্মক্ষয়ী নেশায়।' আর অন্যদিকে 'মূঢ় বারণাবতের উৎসবে মেতে উঠেছে নগর'। গোটাদেশ— যেন জতুগৃহ! অতঃপর—

> "যুগান্তর হয়ে গেছে তারপর। শুরু হয়ে গেছে পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল শাসন। দণ্ডকারণ্যের বিচ্ছিন্ন নিরুপায়তা থেকে এবার তবে হয়তো-বা ফিরে যাওয়া যাবে দেশে, ভেবেছিল তারা অনেকে, কিংবা হয়তো ভাবানো হয়েছিল তাদের।

বড়ো বড়ো ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা তো শুধু খড়, অবোধভাবে এপথে ওপথে উড়ে চলে যায়। হাজার হাজার মানুষ এবার তাই উড়তে লাগল দেশের মুখে, যেন তাদের স্বরাজ এল এতকাল পরে! নিজের দেশে নিজের ঘর হবে বলে কোথায় কোন্ উড়ো খবর পেল তারা! কিন্তু সবকিছু নিয়ে এখানে পৌঁছে তারা দেখে, তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে শুধু পুলিশের লাঠি। নতুন তাণ্ডবে নতুন করে উৎখাত হলো সবাই, প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত হলো, আবার তাদের ধরতে হবে ফেরার পথ।''[৪৮]

কবিকে লিখতে হল—

''নিশান বদল হলো হঠাৎ সকালে
ধ্বনি শুধু থেকে গেল, থেকে গেল বাণী
আমি যা ছিলাম তাই থেকে গেছি আজও
একই মতো থেকে যায় গ্রাম রাজধানী

কোনো মাথা নামে আর কোনো মাথা ওঠে
কথা ছুঁড়ে দিয়ে যায় সারসের ঠোঁটে।''[৪৯]

আবার—

''হাতের কাছে ছিল হাতেমতাই
চুড়োয় বসিয়েছি থাকে
দু-হাত জোড় করে বলেছি 'প্রভু
দিয়েছি খত দেখো নাকে।
এবার যদি চাও গলাও দেব
দেখি না বরাতে যা থাকে—
আমার বাঁচামরা তোমারই হাতে
স্মরণে রেখো বান্দাকে!'

ডুমুরপাতা আজও কোমরে ঝোলে
লজ্জা বাকি আছে কিছু
এটাই লজ্জার। এখনও মজ্জার
ভিতরে এত আগুপিছু!
এবার সব খুলে চরণমূলে

ঝাঁপাব ডাঁই-করা পাঁকে
এবং মিলে যাব যেমন সহজেই
চৈত্র মেশে বৈশাখে।''[৫০]

মূলত এই কবির যাত্রাপথবেলা এইরকম— বোমা-বারুদ-সাইরেন-রেশনে লাইন-মৃত্যুভয়-অনাহার-মৃত্যু, স্বাধীনতা-দেশভাগ-গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা। স্বাধীনতা-গণতন্ত্র, খাদ্যমিছিল ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, শ্রমিক ও শিল্প ধর্মঘট, সাধারণ নির্বাচন, সরকার গঠন— পুনরায় সরকার গঠন, আন্দোলন এবং একাধিক খুন-হত্যা-শাসকের মাতব্বরি! তবে কি অপরদিকে বা সমান্তরালভাবে কোথাও কোন শঙ্খধ্বনি অথবা সাদা পায়রা ওড়ানো ছিল না? ছিল। ছিল— মানুষের শান্তিমিছিল, প্রার্থনা, শুভ প্রয়াস, ভাঙনে পুনরায় মাটি তোলা। স্বপ্ন ও স্বপ্নপতনের দূরত্বের মধ্যেও তিনি শুনেছেন আজানের ধ্বনি এবং খরাকালে বৃষ্টির শব্দ— গহিনগাঙের ফাঁক-ফাঁকির সরল অথচ অনিবার্যকথা, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আভিঘাতরাশি, ভিটেমাটির মায়া-মমতা-ত্যাগ-যন্ত্রণা কথার সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার কথা। চারপাশের দেখাকে আত্মস্থ করে-রূপ-রেখা-রঙ-লাবণ্যে মূর্ত করে তুলেছেন পরম যত্নে। তাঁর পরিচয়— সমাজ দেশ কালকথা, বিগত অভিজ্ঞতা জীবন ও রক্তপাতকথা, ইতিহাসের পাঠ আর যাপনকথা— বিশ্ব আর ব্যক্তিকে নৈর্ব্যক্তিকতায় উত্তম পুরুষেও বড় বেদনায়, সমালোচনায়, ভালোবাসায় অঙ্কন করাতে।

> ''রক্তসংকেতে শেষ হল আমূল বদলের বাম দর্শন। আমরা শিখলাম আদর্শ ও আদর্শহীনতার সহাবস্থানের বিকল্প পাঠ, ধ্বংস ও গঠনের অন্তরায়হীন অনুকূল সম্পর্কের কথা। দেখলাম জয়-পরাজয় একইসাথে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বিষণ্ণ শূন্যতায়। সত্তর দশক জুড়ে সেই টালমাটাল অবস্থা জন্ম দিল অবক্ষয়ের, অরাজকতার। প্রাচীন ভাববাদী অথবা আদর্শগত রাজনৈতিক মূল্যবোধের অভাবে স্বার্থান্বেষী বিচ্ছিন্নতার প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত সমাজে, সংস্কারে। আশ্রয়হীন বিশৃঙ্খলার ভিতরেই প্রোথিত আমাদের ঘোর-লাগা সত্তার শিকড়। এই নিরাশ্রিত অবস্থানটিকে ভরাতে আঁকড়ে ধরলাম বস্তুকেন্দ্রিক পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ক্রমশ সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে নিল বাজার চলতি সেই পণ্য-আধুনিকতা।''[৫১]

—ঘটনাবহুল সাতের দশকের পর অর্থাৎ নকশালবাড়ি আন্দোলন, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, জরুরী অবস্থা জারি— মানুষ ও মানবতার অপমানের পরবর্তীতে গুটি-গুটি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে আটের দশক; ততদিনে রাষ্ট্রের নির্মম কঠোর নিষ্ঠুরতায় নিভে গেছে সাতের দশকের মুক্তির প্রদীপ আর ক্রমশ গ্রাস করে নিয়েছে 'পণ্য-আধুনিকতা'! কবি লিখলেন—

''একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্য গলির কোণে

ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

একটা দুটো সহজ কথা
বলব ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।
...
মুখের কথা একলা হয়ে
রইল পড়ে গলির কোণে
ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু
ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।''[৫২]

যে কবি ক'দিন আগেই শুনেছেন ''পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'' (১৯৮০)। লিখেছেন—

''পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, রক্তে জল ছলছল করে
নৌকোর গলুই ভেঙে উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ
জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর
অমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে।''[৫৩]

আবার—

''মাটি খুব শান্ত, শুধু খনির ভিতরে দাবদাহ
হঠাৎ বিস্ফারে তার ফেটে গেছে পাথরের চাড়।
নিঃসাড় ধুলায় দাও উড়িয়ে সে লেখার অক্ষর
যে লেখায় জ্বর নেই, লাভা নেই, অভিশাপও নেই।''[৫৪]

লিখেছেন—

''সেই মেয়েটি আমাকে বলেছিল :
সঙ্গে এসো, বেরিয়ে এসো, পথে।
আমার পায় ছিল দ্বিধার টান
মূহূর্তে সে বুঝেছে অপমান
জেনেছে এই অধীর সংকটে
পাবে না কারো সহায় একতিলও—
সেই মেয়েটি অশথমূলে বটে

বিদায় নিয়ে গাইতে গেল গান।
আমি কেবল দেখেছি চোখ চেয়ে
হারিয়ে গেল স্বপ্নে দিশাহার
শ্রাবণময় আকাশভাঙা চোখ।
বিপ্লবে সে দীর্ঘজীবী হোক
এই ধ্বনিতে জাগিয়েছিল যারা
তাদেরও দিকে তাকায়নি সে মেয়ে
গ্লানির ভারে অবশ ক'রে পাড়া
মিলিয়ে গেল দুটি পায়ের শ্লোক।''[৫৫]

নিজের দ্বিধা— ভিটেমাটি ছেড়ে আসার যন্ত্রণা, নাগরিক সমাজের মুখোশ দেখা, নিশান বদলের লম্বা লাইন এবং শেষ হয়ে আসতে থাকে সত্তরের দশক! দেয়ালের মুক্তির লেখাগুলি মুছে আসে অল্পে অল্পে— সব যথাযথ না হলেও 'কানামাছি'-র সংসারে ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যপাটে বেমানান নয় অর্থাৎ অস্বাভাবিকতা দিনে দিনে স্বাভাবিক রূপ নিয়েছে। ইতিহাসের ইতিহাসে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাম্য, অনাচার, অত্যাচারীকে ঘৃণা করতেন, স্বপ্নময় দু-চোখে স্বপ ছিল বৃহৎমহৎ মিলনের— তাঁরই স্বপ্নের শিক্ষাস্থানে যদি কেউ অন্যের কৌতুকের শিকার হয়— 'আবরণে আচরণে উচ্চারণে'-দূরত্বের কারণে। তবে! তবে—

''এখানে আমাকে তুমি কিসের দীক্ষায় রেখে গেছ?
এ কোন্ জগৎ আজ গড়ে দিতে চাও চারদিকে?
এ তো আমাদের কোনো যোগ্য ভূমি নয়, এর গায়ে
সোনার ঝলক দেখে আমাদের চোখ যাবে পুড়ে।
বুঝি না কখনো ঠিক এরা কোন্ নিজের ভাষায়
কথা কয়, গান গায়, কী ভাষায় হেসে উঠে এরা
পিষে ধরে আমাদের গ্রামীণ নিশ্বাস, সজলতা,
কী ভাষায় আমাদের একান্ত বাঁচাও হলো পাপ।
আমার ভাইয়ের মুখ মনে পড়ে। গ্রামের অশথ
মনে পড়ে। তাকে আর এনো না কখনো এইখানে।
এইখানে এলে তার হৃদয় পাণ্ডুর হয়ে যাবে
এইখানে এলে তার বিশ্বাস বধির হয়ে যাবে
বুকের ভিতরে শুধু ক্ষত দেব রাত্রির খোয়াই।
আমার পৃথিবী নয় এইসব ছাতিম শিরীষ

সব ফেলে যাব বলে প্রস্তুত হয়েছি, শুধু জেনো
আমার বিশ্বাস আজও কিছু বেঁচে আছে, তাই হব
পঁচিশে বৈশাখ কিংবা বাইশে শ্রাবণে আত্মঘাতী।''[৫৬]

'এখানে আমাকে তুমি কিসের দীক্ষায় রেখে গেছ?'— 'আমাকে তুমি'! শঙ্খ ঘোষের কবিতায় 'তুমি' আর 'আমি'— বহুতল নিয়ে আসে— 'তুমি' নিকটনারী বা প্রেমিকা,' ঈশ্বর বা জীবনদেবতা বন্ধু বা জনসমাজ। অন্য সত্তা এবং অনেক সময়ই কবিরই আরেক 'আমি' যাকে 'তুমি' সম্বোধন করা হয় অর্থাৎ 'অলটার ইগো'— নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা। অন্যদিকে 'আমি'রও নানা রূপ— 'ছোটো আমি' এবং 'বড়ো আমি'র পরেও 'আমি' উঠেছে 'আমরা'। 'ব্যক্তিআমি' 'বিশ্বগতআমি' হয়ে 'আমাদের' অবস্থাকে প্রকাশ করেছে অর্থাৎ সেখানে 'আমি' থেকেও 'আমি' আর 'আমি' নই— 'আমরা'-র অবস্থাকে। প্রকাশে বর্তমান 'আমাদের' আশা-সংকট-আত্মসমালোচনা-বেদনা। 'আত্মঘাত' কবিতায় 'আমি'ই অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ— একাকার হয়ে ওঠে 'ভারতবর্ষ' নামক দেশের ঐতিহ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৪৭, ৫১,৬৭, ৮১, ২০০৭ সাল অথবা একাকার হবে আরো অদূর অতীত সুদূর ভবিষ্যৎ-এর কোন ঘটনা।

আটের দশকে যে বিজ্ঞাপন সতর্ক পদক্ষেপে ঘর পর্যন্ত পৌঁছয় সেই বিজ্ঞাপনের শিকার আজ প্রত্যেকেই এবং নিজে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার অধিকারে। কিন্তু পণ্যমুখী সভ্যতার করাল গ্রাসে বিশ্বায়নমুখী বাণিজ্যায়নের প্রসারকালে, ভোগ সর্বস্ব বহুবিচিত্র বাণিজ্যভূমিতে জ্বলে ওঠা নিভে যাওয়া নিয়ন আলোর খেলায় স্বাধীনতা কতটুকু? চাঁদ বণিক, চাঁদ পিতা— পিতা চাঁদ কি পারবে এই নতুন বাণিজ্যকৌশল থেকে সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করতে! এই বিশ্ববাণিজ্যের জাঁকজমক থেকে?

''আমি শুধু এইখানে প্রহরীর মতো জেগে দেখি
যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস লাগে
যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে
হেতালের লাঠি যেন এ-কালপ্রহরে মনে রাখে
চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে।''[৫৭]

—'চম্পকনগরে আজ কানীর চক্রান্ত চারদিকে'! লেখা হয়— 'লজ্জা', 'মন্ত্রীমশাই'— একদিকে রকমারী আয়োজন এবং অপচয়, পুলিশবাহার, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অফিসঘর, সুপার স্পেশালিটি বে-সরকারী হাসপাতাল, কম্যুনিটি হল, জিম, নৃত্যালয়, ফ্যাশন-পার্টি, দীর্ঘ কনভয় আর অন্যদিকে—

''বাবুদের লজ্জা হলো
আমি যে কুড়িয়ে খাব

সেটা ঠিক সইল না আর
...
বাবুদের কাচের ঘরে
কত-না সাহেবসুবো
আসে, আর দেশবিদেশে
উড়ে যায় পাখির মতো—
সেখানে মাছির ডানায়
বাবুদের লজ্জা করে।

আমি তা বুঝেও এমন
বেহায়া শরমখাকি
খুঁটে খাই যখন যা পাই
সুবোদের পায়ের তলায়।
খেতে তো হবেই বাবা
না খেয়ে মরব না কি!
...
গারদে বয়েস গেল
তা ছাড়া গতরখানাও
বাবুদের কব্জা হলো—
হলো তো বেশ, তাতে কি
বাবুদের লজ্জা হলো?''[৫৮]

বিবর্তিত সমাজে সুকৌশলী অন্ধকার থাবা বসিয়েছে রকমফেরভাবে— যৌথজীবন-যাপনকালে জীবন জীবনকে পরিপূর্ণরূপে পেয়ে বেঁচে ছিল। কিন্তু তারপর শ্রমের বিভাজন, লাঙলের ব্যবহার— যাপনের রদবদল ইত্যাদির ফলে নারীর ভূমিকা স্থানান্তরিত হয় অন্দরমহলে অর্থাৎ প্রজননমুখী ভূমিকায় এবং পুরুষের জন্য বরাদ্দ হয় বাইরের জগতের উৎপাদনমুখী ভূমিকা। ক্ষমতাবান পুরুষ এভাবেই একটি বিভাজন রেখা তৈরি করে নেয়— যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে রূপ নেয় 'পুরুষতন্ত্র'-এ। 'পুরুষতন্ত্র' সাম্প্রতিক 'পুঁজিতন্ত্র' ও বিগত 'সামন্ততন্ত্রের' এক প্রাগৈতিহাসিক রূপ এবং লিঙ্গ-রাজনীতির সূচনাবিন্দু। এই লিঙ্গ-রাজনীতির ফলে একটি মানুষের (বিপরীত লিঙ্গ) পাঁজরে প্রতিনিয়ত হাতুড়ি পেটানোর মতো সজোরে আঘাত করে থাকে আর তা চৌকাঠের এপার থেকে শুরু করে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রাথমিক স্তর পার করে ধাক্কা দেয় সর্বস্তরে। এই

সাজানো 'ম্যাপ' পাল্টাতে ভারতীয় পুরুষ যারপরনাই আগ্রহী ছিলেন। যথা— রাজা রামমোহন রায়; গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার; বিদ্যাসাগর; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

> "WOMAN? Very simple, say the fanciers of simple formulas: she is a womb, an ovary; she is a female—this word is sufficient to define her. In the mouth of a man the epithet female has the sound of an insult, yet he is not ashamed of his animal nature; on the contrary, he is proud if someone says of him: 'He is a male!' The term 'female' is derogatory not because it emphasizes woman's animality, but because it imprisons her in her sex; and if this sex seems to man to be contemptible and inimical even in harmless dumb animals, it is evidently because of the of the uneasy hostility stirred up in him by woman...Females sluggish, eager, artful, stupid, callous, lustful, ferocious, abased—man project them all at once upon woman. And the fact is that she is a female."[৫৯]

—দীর্ঘ 'লিঙ্গ' রাজনীতির শাসন-শোষন-দাপটে পুরুষতান্ত্রিক পুরুষ 'নারী'কে করে রেখেছে বাইরে সেবিকা ভেতরে দাসী! নারী তার নিজের জন্য পায়নি একটি কক্ষও! এই ঘনঘোর আবহে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় নারীর অবস্থান কোন বলয়ে? যে কবির কাব্যে উচ্চারিত হয়— 'আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা'; 'এমন আকাশ হবে তোমার চোখের মতো ভাষাহীন নির্বাক পাথর...'। অথবা—

> ''মাগো, আমার মা—
> ঝড় নেমেছে, দুয়ারে তার ঝঞ্ঝা লাগো-লাগো
> তুমি আমার বাজনা শুনে শঙ্কা মেনো না।
> বাজনা বাজুক, ভয় পেয়ো না, বাজনা বাজুক মা!''[৬০]

—যেখানে 'যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে' আবার—

> ''দুপুরে-রুক্ষ গাছের পাতার
> কোমলতাগুলি হারালে—
> তোমাকে বক্‌ব, ভীষণ বক্‌ব
> আড়ালে।''[৬১]

—এরকম নানা উচ্চারণ পাশাপাশি অবস্থান করে! শঙ্খ ঘোষ তাঁর কাব্যে নারীকে আঁকলেন স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে, মানুষ রূপে— কেবল মাত্র কন্যা-স্ত্রী-মাতারূপে নয়। আলোচ্য যখন 'নারী' তখন

একজন কবির প্রেমভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতাতে প্রেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং 'তুমি'কে স্বীকার করে নিয়ে কবি একই সঙ্গে ভিক্ষুক-প্রতিবাদী এবং আত্মবিশ্লেষণরত। তাঁর কবিতার প্রেমিক 'নারী'রা সামাজিক, আত্মকেন্দ্রিক নয়— কিন্তু আত্মসচেতন। প্রেমিক-নারী ভাবনা কবি শঙ্খ ঘোষের কাব্যে উজ্জ্বল-আলোকময়।

> ''স্বাধীনতার পরে পঞ্চাশ বছরে সবচেয়ে বড়ো বদলটাই ঘটেছে মেয়েদের জীবনে, মেয়েদের স্বাধীনতার বোধে। আমাদের কৈশোরে সমাজজীবনে মেয়েদের যে-অবস্থান দেখেছি আর আজ যা দেখি, তার বদলের পরিমাণ ভাবলে অভিভূত লাগে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের দেশের মেয়েরা খুব ভালো আছে এখন। চলনেবলনে কাজেকর্মে দায়দায়িত্বে মেয়েদের মুক্ততা যোগ্যতা ক্ষিপ্রতা অনেক বেশি আজ, কিন্তু সমাজ এখনও পৌরুষের প্রতাপ থেকে তাকে অভ্যন্তরীণ মুক্তি দিতে পারেনি। আজও মেয়েদের কষ্টের কোনো শেষ নেই, কেননা নানা ছদ্মপোশাকে পুরুষদাপট এখনও মেয়েদের শাসনের চোখেই প্রভুত্বের চোখেই দেখে। ছদ্মই-বা বলি কেন, ঘরের মধ্যে পৌঁছলে অনেক সময়েই সে ছদ্ম তো বেশ প্রকট চেহারাই নেয়। শিক্ষা যে এ-ব্যাপারে কোনো মুক্তি এনে দেয়, একথা বলবার মতো সময় হয়নি এখনও। ঘরেবাইরে দুটো দিকই সামলে চলার পরেও অধিকাংশ মেয়েই এখনও পর্যন্ত অনিশ্চিত লাঞ্ছিত অপমানিত। কেবলমাত্র পণপ্রথা বধূনির্যাতন অগ্নিদাহ— এগুলির কথা ভেবেই যে এসব বলছি তা নয়। এসব তো প্রকটভাবেই দেখা যায়। কিন্তু যা প্রকাশ্যত দেখা যায় না, গোপন সেই মানসিক মারগুলো যে কীভাবে কুরে ফেলছে এক-একটা পরিবারকে তার কোনো হিসেব তৈরি করা শক্ত। তাই, 'লিখে রাখি জলের অক্ষরে/ আমার মেয়েরা আজও অবশ ভিক্ষার হাতে পড়ে আছে সব ঘরে ঘরে।''[৬২]

—'মেয়েদের সামাজিক অবস্থান' বিষয়ে কবির 'যমুনাবতী', 'বুড়িরা জটলা করে', 'লজ্জা', 'মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়', 'আমার মেয়েরা', 'হাসি', 'সামাজিক', 'একটি মেয়ে' কবিতাসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান। 'সদর্থক অনেক বদল ঘটলেও 'মারগুলো' এখনো ঘাঁটি গেড়ে আছে। স্বাধীনতার অনতিদূরে—

> ''কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুলঢেউ তোলে, জ্বলে না—
> মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না—
> চলল মেয়ে রণে চলল!''[৬৩]

মা— অপমানিত হতে-হতে দেওয়ালে এসে ঠেকেছে; মেয়ে— সেও অপমানিত! মা— দোষ দেয় 'মিছিল'কে আর মেয়ে— মারা যায় স্বাধীন দেশে খাবারের অধিকারের মিছিলে এসে! স্বাধীন দেশেও একটি 'মেয়ে'কে মেরে ফেলা যার শুধুমাত্র 'কর্ডন' ভাঙনের দোহাই দিয়ে আশ্চর্য

'পুরুষতান্ত্রিক' শাসন-শোষণ। মানুষের অপমান! অথবা 'আমার মেয়েরা' কবিতায়—

''লিখে যাই জলের অক্ষরে
আমার মেয়েরা আজও অবশ ভিক্ষার হাতে পড়ে আছে সব ঘরে ঘরে।''[৬৪]

যে কবির রচনায় বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ মিলে এক তৃতীয় জগৎ-এর কথা উঠে আসে; জেগে ওঠে তৃতীয় সত্তা সেই কবির রচনায় 'ভুখা' মানুষের মিছিল নিজের 'মিছিল' হয়ে যায় এবং লিখিত হয় অসহায় নারী তথা মানুষের কথা। এই হেতু তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নন 'দোয়ায়' বসতে— যদি আরো কিছু আলো যোগ হয় জীবনে; বেঁচে থাকায়! কিন্তু যে সমাজের মানুষের— শাসক-শোষকের দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসন-শোষণ; দেশাত্মবোধ আর রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা বড় বেশি অসুস্থ; দুর্নীতি আর বিশৃঙ্খলায় একে-অপরের প্রতি আঙুল তুলতে সিদ্ধহস্ত; 'শুধু মন্ত্রীগড়ার খবর, আমলাদের খবর, রাষ্ট্রসংঘাত আর আত্মসংঘাতের খবর।' কে কোথায় কোন জেলে কিংবা রেল স্টেশনে বা ফুটপাতে পড়ে মরছে তার খবর দেবার বা নেবার লোক কোথায়! লজ্জা! আত্মিকতার অভাব— সেখানে 'মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়!'—

''তারপর বিসর্জনের
জোড়া ঢাক পাড়ায় পাড়ায়
এ-রকম ঘটেই থাকে
ভেবে লোক কষ্ট তাড়ায়
কিছুদিন স্থির থাকে জল
ছবিও দেয় অবিকল—
কবে ফের মত্ত মাদল
সে-জলের গ্রাসকে নাড়ায়
ভেবে সব খুঁজছে পুতুল
মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়!''[৬৫]

অথবা—

''গল্পে এসব পড়েছিলাম অনেক
জানতামই না সত্যিও যে হয়—
...
মুশকিল কী? এইকথা ভাবছ তো?
কামড়ে কি দেয়? অন্তত নয় রোজ
সবার চোখের আড়াল হয়ে এলে
শরীর মনে ধারালো সব দাঁত।

...

সভ্য একটা শতাব্দী শেষ হলো

আমরা আজও কখনো নই আমি!''[৬৬]

এইসব উচ্চারণের মজ্জায় লেগে আছে নারী বিষয়ক চেতনার স্বর; মানুষের মুক্ত হবার কথা। তথাকথিত 'ছেলেরা ছেলেদের মতো লিখবে'— 'মেয়েদের কথা বলবে মেয়েরা'-এর সমান সময়ে দাঁড়িয়ে কবি শঙ্খ ঘোষের উচ্চারণ পাঁজরে কাঁপন ধরায়; উঠে আসে মানুষের কথা। 'নারী' মানুষ— পেষক বা শোষক নয়। আত্মসচেতন মানুষ। অবহেলিত কিন্তু স্বাধীনসত্তাযুক্ত— তাই আঙুল ক্ষমতাতন্ত্র'-এর দিকে। কেননা 'ক্ষমতা' হাতে পুরুষ বা নারীতে কোন ভেদ থাকে না। তাই তাঁর উচ্চারণ মানুষ 'নারী'র প্রতিবাদ ও বেদনার।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এবং ভারতভাগ, ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষের কুচবিহারে খাদ্যমিছিল এবং মিছিলে পুলিশের গুলি চালনায় কিশোরীর মৃত্যু-আরও কয়েকটি মৃত্যু-প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ১৯৫৯ তে সারা পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য আন্দোলন-ভুখামিছিল, ময়দানে কৃষক সমাবেশ এবং পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলিচালনায় সাধারণ মানুষের মৃত্যু! পরবর্তীতেও খাদ্য-সংকট এবং মৃত্যু অব্যাহত। অথচ নির্বাচনের পর নির্বাচন এবং পুনরায় নির্বাচন— সরকার গঠন এবং সরকারের ভাঙন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 'বাবু', 'মন্ত্রী', 'আমলা'— 'বাবুদের' লজ্জা হয়? স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও যেখানে নানা 'পরিকল্পনা' এবং তার নিয়মের বাইরে-ভেতরে পড়ে খেতে না পেয়ে মরতে হয়! যেভাবে মরতে হয়েছে স্বাধীনতার সকালবেলায়! 'বাবুদের' লজ্জা হয়! হয় না। আর হয় না বলেই ক্ষোভ যন্ত্রণা আত্মসংকট এবং গভীর বেদনায়—

''মন্ত্রীমশাই আসবেন আজ, তখন তাঁকে
একটি কথা বলব আমি।
বলব যে এই যুক্তিটা খুব বুঝতে পারি
সবাইকে পথ দেবার জন্য কয়েকজনকে সরতে হবে।
তেমন-তেমন সময় এলে হয়তো আমায় মরতে হবে
বুঝতে পারি।
এ-যুক্তিতেই ভিটেমাটির ঊর্ণা ছেড়ে বেরিয়েছিলাম
অনেক আগের রাতদুপুরে ঘোরের মতো
কণ্ঠাবধি আড়িয়ালের ঝাপটালাগা থামিয়েছিলাম
কম্বুরেখায় অন্ধরেখায় মানিয়েছিলাম
ছাড়তে হবে
সবার জন্য কয়েকজনকে ছাড়তে হবে।

কিন্তু সবাই বলল সেদিন, হা কাপুরুষ হৃদ্দ কাঙাল
চোরের মতো ছাড়লি নিজের জন্মভূমি!
জন্মভূমি? কোথায় আমার জন্মভূমি খুঁজতে খুঁজতে জীবন গেল।''[৬৭]

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা-আন্দোলন এবং আত্মপরিচয় খোঁজ অথবা জন্মভূমির খোঁজ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়— কিন্তু এই অ-বিচ্ছিন্ন ঘটনা একজন সহৃদয়-সামাজিক মানুষের মর্মে যে কী নিদারুণ বেদনার সৃষ্টি করতে পারে তা এই কবির কবিতার দিকে আলো না ফেললে দেখা সম্ভব নয়। তবে এই দেখাই ইতিকথা নয়, কথা আরও বেশি নীবরতা-প্রতিবাদের মাত্রা পেয়েছে যখন তিনি দেখেন স্বাধীনতার কয়েক দশকেও অন্ধকার অবস্থা খুব-বেশি আলোকিত হয়নি, যা হয়েছে তা সময়ের নিরিখে যৎসামান্য। কবি হ্যাঁ-বোধক, তবে সমালোচক— প্রতি মুহূর্তের, আলোহীনতার কারণের, দায়িত্ব-দায়ের।

''যোগ সাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুজে, শ্বাসপ্রশ্বাস দমন করে; কিন্তু শিল্পসাধনার প্রকার অন্য প্রকার— চোখ খুলেই রাখতে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর খোলা পাখির মতো মুক্তি দিতে হয়— কল্পনালোকে ও বাস্তবজগতে সুখে বিচরণ করতে। প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন-ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তারপর বসে থাকা— বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে, চুপটি করে নয়— সজাগ হয়ে।''[৬৮]

শঙ্খ ঘোষের কবিতা নিছক ক্রিয়া-বিশেষণ, কথার কথা— শব্দের নিরর্থক কঙ্কাল নয়। তাঁর কবিতার ভেতরে— স্পষ্ট উচ্চারণ, রাগ-ক্রোধ-ক্ষোভ-সমালোচনা-আত্মসমালোচনার সঙ্গে প্রগাঢ় বেদনা এবং পরম শান্তি রয়েছে; যা স্মৃতিময় অতীত এবং স্ফুরিত ভবিষ্যতের যোগে বর্তমানের যাবতীয় মালিন্যযুক্ত অপমান থেকে শান্তি দেয়।

''আমি এই শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে কথা বলি
আমি এই শালপ্রাংশু মধ্যরাত্রি থেকে কথা বলি
আমার মায়ের রক্ত হাতে নিয়ে আমি কথা বলি
হোলি খেলেছিল যারা আমার মেয়ের রক্ত নিয়ে
আগুন জ্বালিয়ে যারা শবের উপরে নেচেছিল
এই শেষ অন্ধকারে তাদের সবার কথা বলি
আর যারা চুপ ছিল যারা কিছু দেখেও দেখেনি
একাকার মনে যারা অনায়াসে ছিল অন্যমনে
দলের ভিতরে যারা দলবৃত্তে অন্ধ হয়ে ছিল
অথবা মৃতই ছল— সেইসব প্রাক্তন হৃদয়ে

একমুঠো ছাই ছুঁড়ে পিছনে না চেয়ে ফিরে এসে
নক্ষত্রের ক্ষত বুকে রক্ষাবাহিনীর ব্যূহমুখে
এই শতাব্দীর শেষ ভূমিহারাদের কথা বলি
বলি যে জাতক বীজে মাটির কেশর মেখে মেখে
এক মরণের থেকে আরেক মরণে যেতে যেতে
আমার আমির থেকে জেগে ওঠে আরো আরো আমি
আমিই শতাব্দী আমি আদিঅন্তহারা মহাদেশ
আমি এই শতাব্দীর শহিদশিখর থেকে বলি
মৃত্যুর ভিতরে আজ কোথাও মৃত্যুর নেই লেশ
দেখো এ মৃত্যুর মধ্যে কোথাও মৃত্যুর নেই লেশ।''[৬৯]

তাঁর কবিতা সমকাল, অতীতের পাঠ বা অভিজ্ঞতা, পুরাণ— যে পুরাণ বর্তমান পরিস্থিতিকে উজ্জ্বলতর-কালাতীতের পটভূমি এনে দেয়, 'যুগআমি'র সঙ্গে 'বিশ্বআমি'— শৈল্পিক দৃষ্টিসহ বহুস্তরীভূত উচ্চারণ— জীবন-সমৃদ্ধ এবং কারুময়ভাবে দেশ-কালের ভিতরে থেকেও দেশ-কালাতীত।

''দিনগুলি রাতগুলি'— শঙ্খর প্রথম সংকলনের কবিতাগুলি নিঃশব্দ কবিতা নয়। তার মধ্যে শব্দবিলাস শব্দের উল্লাস অনেক বেশি। আঠারো থেকে বাইশ বছরের লেখা কবিতায় সেইটেই স্বাভাবিক— কবিতাগুলি যৌবনের উত্তাপে লেখা, প্রেমের উষ্ণতায় লেখা। সেখানে 'বন্ধুমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা'কে অতিক্রম করে 'রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।' ছন্দ নিয়ে, শব্দ নিয়ে, সে এক তুমুল পরীক্ষার সময়— প্রথম পদক্ষেপের উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা, উল্লাস সবই তার মধ্যে আছে। আর আছে হৃদয়ের মধ্যে ধানে-গানে পরিপূর্ণ বসুধাকে, তার অপার ভালোবাসাকে টেনে নিয়ে আসা।... কবিতার বইগুলোয়, বারে-বারে। 'নিহিত পাতালছায়া' থেকেই তুমি তোমার স্বতন্ত্র স্বর খুঁজে পেয়েছো— সেখান থেকেই শুরু হয়েছে তোমার আত্ম-আবিষ্কার। অশান্ত রক্তিম তপ্ত উচ্ছলতার পরিবর্তে শুরু হয়েছে তীব্র এক অনুসন্ধান। এই কবিতাগুচ্ছ রচনার আগে-আগেই তুমি আমাকে লিখেছিলে (৩১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮), 'জীবনকে অত্যন্ত প্রসাদের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবার অভ্যাস আমি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি।' একদিকে তাই যেমন চলে আত্মপরিচয় খোঁজা, অন্যদিকে প্রখর হয় সমাজবিষয়ে চৈতন্য— অথবা হয়তো দুটো কথা একই কথা। বিশ্বসমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতনতার দরুন সে মার্কিন প্রবাসকালে আইওয়া থেকে লেখা প্রত্যেক চিঠিতে ভিয়েৎনাম সম্পর্কে

জনসন-কেনেডি-ম্যাকার্থির ভূমিকা বিষয়ে লিখতে ভোলে না, মার্কিন যুবসমাজের যুদ্ধবিরোধিতার কথা না জানিয়ে পারে না, কবিতা বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন, 'বরফজমা শীতের মাঠে প্রতিবাদরত মেয়েদের উপর মুদগর তোলে গণতন্ত্রী পুলিশ'। প্রদেশের রাজনীতি-সমাজনীতি সম্পর্কেও তীব্রভাবে সজাগ থাকে তার মনীষা ও ইন্দ্রিয়। এই সবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিজের সত্তাকে সন্ধান।''[৭০]

তিনি যেন, 'বাজনাদার'—

''বৃষ্টির এই ঝাপটের ভিতর থেকে উঠে আসছে মধ্যরাতের ঘন্টা
বাজনাদার একা ভিজে যাচ্ছে অন্ধকারে

ঘুমের মধ্যে এপাশ ওপাশ করছি আমরা, ঢলে পড়ছি
কোনো কোনো স্বপ্নের গায়ে
বাজনাদার একা ভিজে যাচ্ছে অন্ধকারে

কেউ তার থাবা বুলিয়ে যায় আমাদের কপালের ওপর
জানি না তার কতদূর নখ

মসৃণতা কতদূর, সে কি আমাদের জাগিয়ে দিতে চায়
না কি নিতে চায় আরো বেশি ঘুমে

সেকথা জানি না, শুধু শ্রাবণের গন্ধ ঘিরে নেয় আমাদের ঘুম
আর ভিতরে ভিতরে

আমরা তৈরি হতে থাকি কাল সকালের আধা জীবনের জন্য
বাজনাদার একা ভিজে যায় অন্ধকারে।''[৭১]

একই সঙ্গে 'নচিকেতা', 'জাবাল সত্যকাম', 'আরুণি উদ্দালক'— একজন পিতা এবং আত্মসচেতন মানুষ। লিখে রাখেন— 'মেয়েদের পাড়ায় পাড়ায়', 'কালযমুনা', 'একটি মেয়ে, মাকে'। বাচালতা নয়, নীরবতা— এই নীরবতার অর্থ মেনে নেওয়া অথবা শূন্যতা নয়, সমস্ত রকম মূল্যবোধহীন 'অহংকারী' অবস্থা এবং দুর্বলতার দিকে তর্জনী তোলা— বিশ্বের পটে অনবরত নিজেকে খোঁজা—

''এখন লেগেছে বড়ো বেশি ব্যক্তিগত হাওয়া। কিন্তু শঙ্খর কবিতা নিতান্ত ব্যক্তিগত

নয়, বিশ্বের পটে ব্যক্তি সেখানে নিজেকে খোঁজে; সমাজ দৃষ্টিহীন বা বধির জেনেও তাকে এড়িয়ে যায় না। এক দীন আর্তনাদের পুনরুক্তি শুনি, 'কী আমার পরিচয় মা?' দেশের প্রেক্ষায় এই সন্ধান। দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুনুচির অন্ধকার, আমার শরীর ভেঙে জেগে ওঠে ভবিতব্য দেশ, দেশের মূর্তি দেশের ভিতরে নেই আর, আয়তনহীন এই দশদিকে আজ আর আমার দুঃখের কোনো ভারতবর্ষ নেই— এই বিষাদময় দেশচেতনা বাদ দিয়ে শঙ্খর আত্ম-আবিষ্কারময় কবিতার কথা ভাবা যায় না। 'আমি চাই আরো কিছু নিজস্বতা'— শঙ্খের কবিতার নিজস্বতা সত্যাশ্রয়ের মধ্যে। কবিতা তার কাছে নান্দনিক বিলাস বা ব্যসন নয়, কবিতাকে সে সত্যের বাহন করতে চায়। তাই বারে-বারে 'সত্য সে হয়নি বটে, তবুও সত্যের কাছে যেতে হয়েছিল', 'অন্ধকারে সত্য কথা হোক'—

দিনের বেলার মুখোশমালা খুলে
সাহস করে সত্য কথা বল্।

সেই সত্য কথা বলার সাহস এমার্জেন্সির অন্ধকারে বা মরিচঝাঁপিতে সন্ত্রাসের দিনে দেখাতে সে ভোলেনি।''[৭২]

গুজরাত-গণহত্যা, নন্দীগ্রাম-গণহত্যা, কামদুনি-গণধর্ষণ— ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের হিংসা-আবহের প্রতিবাদেও সমানভাবে সক্রিয়। তাঁর 'ঘর যায় পথ যায় প্রিয় যায় পরিচিত যায়'— তিনি একা সেই সমূহ সর্বনাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়েছেন দেশকালের ভয়ঙ্কর সত্যগুলিকে আত্মস্থ করেছেন, সমানভাবে বিচলিত হয়েছেন। এমনকি 'ছেলের তর্পন করছে বাবা'-র কালেও! 'কোন্ মৃত্যু তারও চেয়ে কম মৃত্যু হতে পারে পোড়া এই মৃত্যুমুখী দেশে?'— কেঁপে ওঠা ভিটেমাটিতে। ১৯৫১-এর খাদ্য আন্দোলনের পাশে ১৯৬৭-এর নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান বা আন্দোলন, ১৯৭০-এর সাঁইবাড়ি ঘটনা বা জলপাইগুড়ির ঝাড়মাঝগ্রাম হত্যাকাণ্ড বা বারাসতের হত্যাকাণ্ড, এই বছরেই মেদিনীপুর জেলে হত্যা, ১৯৭১-এর বহরমপুর জেলে ভয়ানক হত্যা, বরানগর-কাশীপুরের হত্যাতাণ্ডব, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে হত্যালীলা সমাপন, ১৯৭৯-এর মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু নিধন, ১৯৮৫-এর মহেশ বসুনিয়া হত্যা' ১৯৯০-এর বানতলা ঘটনা, ১৯৯৩-এর ধর্মতলায় পুলিশি নিধন, ২০০১-এর ছোট আঙারিয়া ঘটনা' ২০০২-এর চাঁদমনি চা বাগানে মৃত্যু সংগঠন, ২০০৬-এর সিঙ্গুর জমি অধিগ্রহণ, ২০০৭-এর ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম ঘটনা, ২০০৮-এর দিনাহাটায় পুলিশের গুলি চালানো, জঙ্গল মহলের ঘটনাবলী অথবা পরিবর্তিত ঘটনাবলীর সঙ্গে বিশ্বের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কিংবা সাম্প্রতিক মানুষ তথা মানবতার অপমান শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বেদনাজড়িত হয়ে উচ্চারিত— ক্ষোভে-শ্লেষে-ব্যঙ্গে। ''দিনগুলি রাতগুলি'' (১৯৫৬) তে যা ছিল 'কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না—মায়ের কান্নায় মেয়ের

উষ্ণ হাহাকার মরে না—চলল মেয়ে রণে চলল!' ছিল 'হাড়' উৎসর্গ করার কথা—শস্যের জন্য। ''নিহিত পাতালছায়া''(১৯৬৭) তে এসে সেই রণ-হাড় উৎসর্গ পৌঁছল আত্মসন্ধানস্থানে। অতঃপর শুরু হয়েছে আত্মানুসন্ধানের সঙ্গে নিজ-শ্রেণী এবং সময়ের মুখ-মুখোশকে তীব্র কশাঘাত, 'সত্য' বলা বেদনায়-ভালোবাসায়। নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্তাল সময়ের আগে-পরে লেখেন ''আদিম লতাগুল্মময়'' (১৯৭২)— 'পাথর', 'দল', 'ইঁদুর' 'ক্রমাগত', 'কলকাতা', 'চিতা'; ''মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'' (১৯৭৪)— 'নির্বাসন', 'বাবুমশাই', 'শব্দের প্রকৃত বোধ', 'তিমির বিষয়ে দু-টুকরো', 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়', 'অন্ধকার', 'আয়ু'; ''বাবরের প্রার্থনা'' (১৯৭৬)— 'ধ্বংস করো ধ্বজা', 'বাবরের প্রার্থনা', 'ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ', 'কালযমুনা', 'ভিখিরি ছেলের অভিমান', 'হাতেমতাই'; ''বন্ধুরা মাতি তরজায়'' (১৯৮৪)— 'রাজার দুলাল', 'স্লোগান', 'বাঘ', 'তুমি আর নেই সে তুমি'। ''আদিম লতাগুল্মময়'' কাব্যগ্রন্থে—

''চোখ বেয়ে নেমে আসে থিকথিক
ঠোঁট দুটো উঁচু হয় টুকুস টুকুস।
সহিতে পারি না আর, খোলো, খুলে রাখো
নকল মুখোশ।
দেহ শুধু চলে যায় ঠিক ঠিক।

বড়ো ঘৃণা কোণে কোণে, ঘর ভরে গিয়েছে ইঁদুরে
প্রণাম চতুর দাঁত
কিন্তু এত জ্বালা কেন মুখে?''[৭৩]

আর অন্যদিকে—

''এইভাবে হতে থাকে ক্রমাগত
কেউ মারে কেউ মার খায়
ভিতরে সবাই খুব স্বাভাবিক কথা বলে
জ্ঞানদান করে

এই দিকে ওই দিকে তিন চার পাঁচ দিকে
টেনে নেয় গোপন আখড়ায়
কিছু-বা গলির কোণে কিছু অ্যাসফল্ট রাজপথে
সোনার ছেলেরা ছারখার

অল্প দু-চারজন বাকি থাকে যারা
তেল দেয় নিজের চরকায়
মাঝে মাঝে খড়খড়ি তুলে দেখে নেয়
বিপ্লব এসেছে কতদূর

এইভাবে, ক্রমাগত
এইভাবে, এইভাবে
ক্রমাগত''[৭৪]

শঙ্খ ঘোষের কবিতা মূলত সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবার কবিতা। বিপ্লবের কবিতা। কেমন বিপ্লবের কবিতা? তাঁর কবিতা অত্যাচার বা অনাচারের বিরুদ্ধে সরাসরি ক্রোধ বা যুদ্ধঘোষণা না করে নীরবে বারবার নিজের মুখোমুখি বসায় এবং চাবুক মারে 'আত্মসম্মান'হীন নির্লজ্জ বর্তমান মেরুদণ্ডহীন কুঁকড়ে যাওয়া অবস্থাকে; ভালোবাসা শেখায় ভালোবাসাহীন আঙুলসমূহকে! স্বপ্ন দেখায় স্বপ্নহীন ভবিষ্যৎকে; সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে চায় পঙ্গু-কুৎসিত যাবতীয় দায়-দায়িত্বকে এবং তা গভীর আন্তরিক বেদনার সঙ্গে।

''এইখানে এসে দাঁড়াই
চারদিকে হাজার হাজার ঝকঝকে চোখ

মানুষের
অন্তত মানুষেরই মতো

পালাবার পথ নেই কোনোদিকে
এগিয়ে অসে চোখ, হাজার হাজার

হাঁটুর মধ্যে জলস্রোত, খসে পড়ে গাছ
আমার হাতে কোনো সুষমা নেই কোনো ছন্দও নেই আর

এ-কোন প্রাংশুলভ্য উন্মাদ তাথৈ থৈ থৈ
আউট
আউট আউট ব্রিফ ক্যান্ড্‌ল্‌
আউট

বলতেই চারদিকে শুরু হয় মানুষের ঝন্‌ঝন্‌ নাচ!''[৭৫]

অতঃপর লেখা হয়েছে ''পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'' (১৯৮০), ''প্রহরজোড়া ত্রিতাল'' (১৯৮৩) এবং ''মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে'' (১৯৮৪)-এর পরে লেখা হয়— ''ধুম লেগেছে হৃৎকমলে''(১৯৮৭), ''লাইনেই ছিলাম বাবা'' (১৯৯৩), ''গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ'' (১৯৯৪), ''শবের উপরে শামিয়ানা'' (১৯৯৬), ''ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার'' (১৯৯৯), ''জলই পাষাণ হয়ে আছে'' (২০০৪), ''সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি'' (২০০৭), ''মাটিখোঁড়া পুরোনো করোটি'' (২০০৯)। রচিত হয় 'অন্ধবিলাপ', 'শিশুরাও জেনে গেছে', 'টলমল পাহাড়', 'স্তব', 'দুর্যোধন', 'তুমি কোন্‌ দলে', 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ', 'আমার মেয়েরা', 'জলেভাসা খড়কুটো'-এর কবিতাগুচ্ছ, 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার', 'একটি মেয়ে, মাকে', 'শহিদশিখর', 'দ', 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি', 'করোটির গান', 'স-বিনয় নিবেদন'। তাঁর 'অন্ধবিলাপ' কবিতায়—

''ধৃতরাষ্ট্র বললেন :

ধর্মক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে সমবেত লোকজনেরা
সবাই মিলে কী করল তা বলো আমায় হে সঞ্জয়

অন্ধ আমি দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
কাজেই কোথায় কী ঘটছে তা সবই আমায় জানতে হবে

সবই আমায় বুঝতে হবে কার হাতে কোন্‌ অস্ত্র মজুত
কিংবা কে কোন্‌ লড়াইধাঁচে আড়াল থেকে ঘাপটি মারে

অন্ধ আমি, দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
এবং লোকে বলে এদেশে যে তিমিরে সেই তিমিরে
...
আমার পাপেই উশকে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয়পিনাক
সর্বনাশের সীমায় সবাই যায় যদি তো শেষ হয়ে যাক
...
শোনাও আমায় শোনাও আমায় শেষের সেদিন হে সময়!''[৭৬]

আবার 'বদল' কবিতায় লেখেন—

''এখন আর আমাদের কোনো অশান্তি নেই।

কেননা আমরা দল বদল করেছি
হয়ে গেছি ওরা।''[৭৭]

রাজনীতির ফাঁস, চালাকি, শোষণ-সংকীর্ণতা ও দলগত মুনাফালাভের ঐকান্তিক প্রয়াসকে নিজস্ব ধরণে অর্থাৎ আত্মসমালোচনায় বিদ্রুপ করেন তিনি। ক্ষমতার লোভ-লালসা-ধরণ ও তার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ পদ্ধতিকে টিপ্পনী কেটে বলেন 'যে যাই বলুক এটাই ধ্রুব— আমার দিকেই ভিড়ছে যুব।' অথবা 'পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ।' এক্ষেত্রে আলোচনা প্রয়োজন যে, শঙ্খ ঘোষের কবিতা মূলত সময়ে-সময়ে বদলে যাওয়া অভিঘাতের চিহ্ন মাত্র নয়, পরতে-পরতে লক্ষণীয় সংযোগের সেতু, এক অখণ্ডতার ধারা এবং সমস্ত বিদ্রুপ-টিপ্পনীর গভীরে রয়েছে গভীরতর নম্র-দঃখ, অনুতাপ-যন্ত্রণা।

'কৃমিকীট জীবন' বাঁচন এবং ধ্বজা বদলের জয়ধ্বনি— শবের সারির পাশে দিনযাপন! এইসব স্বীকার্য এবং আলোচিত, তবে কবির দৃষ্টি আলো উৎসস্থানে, খোঁজ মানুষসকলের যাপনে—

''আমাদের ডান পাশে ধ্বস
আমাদের বায়ে গিরিখাদ
আমাদের মাথায় বোমারু
পায়ে পায়ে হিমানীর বাঁধ
আমাদের পথ নেই কোনো
আমাদের ঘর গেছে উড়ে
আমাদের শিশুদের শব
ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে!
আমরাও তবে এইভাবে
এ-মুহূর্তে মরে যাব না কি?
আমাদের পথ নেই আর
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

আমাদের ইতিহাস নেই
অথবা এমনই ইতিহাস
আমাদের চোখমুখ ঢাকা
আমরা ভিখারি বারোমাস
পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে
পৃথিবী হয়তো গেছে মরে

আমাদের কথা কে-বা জানে
আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।
কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।''[৭৮]

লেখা হয় ''গোটাদেশজোড়া জউঘর'' (২০১০), ''হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ'' (২০১১), ''প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে'' (২০১২), ''বহুস্বর স্তব্ধ পড়ে আছে'' (২০১৪), ''শুনি শুধু নীরব চিৎকার'' (২০১৫), ''এও এক ব্যথা-উপশম'' (২০১৭)। ''দিনগুলি রাতগুলি'' (১৯৫৬) থেকে সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ ''এও এক ব্যথা-উপশম'' (২০১৭)— এই দীর্ঘ যাত্রাপথে দৃষ্টি রাখলে দেখা যায় কবি শঙ্খ ঘোষ যেন সময়ের মানচিত্র-সঙ্কট অঙ্কন অথবা চিহ্নিত করেছেন। ''দিনগুলি রাতগুলি''তে যে 'যমুনাবতী', 'কবর' যে জীবনকথা অঙ্কনের সূচনা তা ''নিহিত পাতালছায়া'' থেকে পরবর্তীতে নমনীয় ও নির্মেদ হয়ে সমাজ দেশকালের সংকট-অভিঘাত জড়িত এবং তা পলে-পলে বিস্তারিত। এই বিস্তারে ভাতের জন্য লাইন এবং প্রাণ বিসর্জন আছে, আছে জন্মভূমির খোঁজ হেতু বিষাদ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা-হীনতা এবং ক্ষোভ সমালোচনা, শিশু ও ভিখিরিদের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাময় কথা, নাগরিকতার সঙ্গে প্রান্তিকতার যোগ ও যোগহীনতার সঙ্গে এক ভিন্নতর বাঁচন-লিপি, মা ও মেয়ে অথবা 'নন্দিনী' ও 'রঞ্জন' নিখোঁজ-সর্বনাশ এবং সর্বোপরি প্রগতির অন্ধকার, রাজনৈতিক জটিলতা স্বেচ্ছাচার ও ক্ষমতা দখলের লালসা-স্থূলতা-অন্যায়। এই সরণীতেই স্বাভাবিকভাবে অথবা 'সত্যি-সঙ্কট' হিসেবে উঠে আসে ''গোটাদেশজোড়া জউঘর'' ''হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ'', ''প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে'', ''বহুস্বর স্তব্ধ পড়ে আছে'', ''শুনি শুধু নীরব চিৎকার'' এবং ''এও এক ব্যথা-উপশম''। অর্থাৎ তিনি তাঁর সময়ের অভিঘাতসমূহকে অথবা সময়ে-সময়ে পরিবর্তিত অভিঘাতসমূহকে অঙ্কন করেছেন অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতির নিজস্ব ও নৈর্ব্যক্তিক পাঠে।

''সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি'' (২০০৭), ''মাটিখোড়া পুরোনো করোটি'' (২০০৯)-এ যে 'তুমি বলেছিলে জয় হবে জয় হবে', 'ধ্বংসকাল ১, ২', 'শীৎকার', 'বিস্ফোরণ', 'কর্ণের স্বপ্ন', 'স-বিনয় নিবেদন', 'গোয়েবেল্‌স্' রচিত হয় এবং তা ২০১০-এ জ্বলে ওঠে— ''গোটাদেশজোড়া জউঘর''। দীর্ঘ শাসন-শোষণের ক্ষয়, এনকাউন্টারে মৃত্যু সমাপ্তি হতে পারত, হয়েওছে। কিন্তু তা কেবল মুখোশ বদল মাত্র; মঞ্চে প্রবেশ এক খলনায়কের বদলে আরেক খলনায়কের— যমজ বলে! অথচ আপামর সাধারণ মানুষ ভেবেছে 'মুখ' এবং 'ভিন্ন-মুখ'! অতঃপর ''হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ'' (২০১১), ''প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে'' (২০১২) রচিত এবং তৎ-পরবর্তী

কাব্যগ্রন্থসমূহ। ‘‘গোটাদেশজোড়া জউঘর’’ (২০১০) কাব্যগ্রন্থে লেখেন—

‘‘সবাই আমরা ভালো করতে চায়।

ওরা এসে আমার ভালো করতে চাইলে
ঘর ছেড়ে এগিয়ে যাই
ওরা কেটে নেয় আমার ডান হাতখানা
ঝুলিয়ে দেয় গাছের ডালে

এরা এসে আমার ভালো করতে চাইলে
মাঠ ছেড়ে এগিয়ে যাই
এরা কেটে নেয় আমার বাঁ হাতখানা
গেঁথে দেয় আলপথে

তার পর

গাছ থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় দুলতে থাকা কাটা হতের
আঙুলগুলি
ডাকতে থাকে আয় আয়
মাটি থেকে রোদ্দুরের দিকে কেঁপে উঠতে থাকে
শুকিয়ে যাওয়া আঙুলগুলি
ডাকতে থাকে আয়
আর সেই ডাক শুনে
ছুটে আসতে থাকে আরো সবাই আমাদের ভালো হবে বলে
খুবই আমাদের ভালো হতে থাকে
সবার দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে ফিনকিতোলা
রক্ত
আর তারই রসে
ঝুলে-থাকা খাড়া-হওয়া কাটা হাতে হাতে
ভরে উঠতে থাকে চারদিকে জমিজমা জঙ্গল শহর।’’[৭৯]

লেখা হয় নিধনকথা! আত্মজন-প্রিয়জন-শত্রুজন— অনীতি নিয়মে চলে নিধন! বিগত দিনে রাষ্ট্র যেভাবে নিজস্ব কায়দায় নিধন চালিয়েছে— স্বাধীনতার পরবর্তীতে সীমালঙ্ঘনের অজুহাতে, বাহাত্তরের নির্বাচনের আগে-পরে এন্‌কাউন্টারে অথবা ২০১০-এর নির্বাচনের আগে-পরে যেভাবে উন্নয়নের নাম করে সাধারণ মানুষকে মেরে কবর দেওয়া— চক্রান্ত করে কিংবা বহিরাগত তকমায়—

‘‘আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে।

দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল
অন্যে কবে না কথা
বজ্রকঠিন রাজ্যশাসনে
সেটাই স্বাভাবিকতা।

গুলির জন্য সমস্ত রাত
সমস্ত দিন খোলা—
বজ্রকঠিন রাজ্যে এটাই
শান্তি ও শৃঙ্খলা।

যে মরে মরুক, অথবা জীবন
কেটে যাক শোক করে—
আমি আজ জয়ী, সবার জীবন
দিয়েছি নরক করে।’’[৮০]

ভালো করার অজুহাতে-অজুহাতে কেটে নেওয়া হয় ডান হাত বাঁ হাত— ‘সবার দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে ফিনকিতোলা রক্ত’! এই ‘সৌপ্তিক পর্বে’ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে কেবলমাত্র ‘আড়চোখে’ দেখে তা নয়, বরং হত্যামন্ত্র শিখে নিয়ে অতর্কিতে ঢুকে পড়েছে ঘুমন্ত শিবিরে, বাস্তু-ভিটায়! আলোর আহ্লাদে জ্বলে উঠেছে গোটাদেশ— যেন সবকিছুই ‘পলিটিক্যালি কারেক্ট’! অতঃপর কি হত্যালীলা থেমেছে অর্থাৎ আরও একবার গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পর? থামেনি, বরং ঘনিয়ে এসেছে ‘হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ’। ভয়ানক সর্বনাশ— এই ভয়ানক সর্বনাশ যেন স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীন সম্পদ! কেবল ভারতবর্ষ কেন? অন্য কোন দেশ নয়! পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান,

ইরাক, সৌদি আরব ভিয়েতনাম, আমেরিকা, রাশিয়া! শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় দেশের ভৌগোলিক মানচিত্রের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের বাঁচা-সত্তার সমস্যা অঙ্কনের পাশাপাশি বিশ্ব-মানুষের বাঁচা-সত্তার কথা সমানভাবে অঙ্কন করেন— একই কবিতার মধ্যে, নিজের ও দেশের মূলকে স্বীকার করে।

> ‘‘জলতলে জাল ফেলে নরমুণ্ড উঠে আসে কটি।
> ‘ও কিছুই নয়’ ব’লে
> হিতব্রতী
> আমরা ফিরিয়ে নিই মুখ।
>
> উৎসব-আসরে বসে মনে মনে বলি :
> ‘আপাতত
> যে ভাবে চলছে, চলুক।’’[৮১]

স্বীকার্য, শঙ্খ ঘোষের কবিতার পরতে পরতে সময়ের চিহ্ন— মানুষের অপমান, সমাজ ভাঙনের শব্দ অথবা ঐক্যহীনতা, আত্মযোগহীনতা, সন্দেহ, বিপন্নতা, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, ক্ষয় ও খুন। তাঁর কবিতায় কুচবিহারের খাদ্য আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকার ভাষা আন্দোলন— খুন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড মিশে যায় আরওয়ালের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে। তিনি লক্ষ্য করেন নির্বাচনের প্রহসন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে মানুষ-মানবতার অপমান এবং পরিণামে আত্মহত্যা। যুগান্তরের পরে—

> ‘‘উদ্বাস্তুজীবী একটি দল কীভাবে উদ্বাস্তুঘাতী হয়ে ওঠে তারই বৃত্তান্ত। নিরবচ্ছিন্ন বাম শাসনের নিরবচ্ছিন্ন সন্ত্রাসের স্টেজ রিহার্সাল হয় মরিচঝাঁপি দ্বীপে। সেই সন্ত্রাসে নিহতের হিসেব সরকার অনেকটাই গোপন করতে পেরেছে, কিন্তু নৃশংসতার মাত্রা চেপে রাখা যায়নি।’’[৮২]

—নতুন-নতুন তাণ্ডব কিন্তু কবি তবুও মানুষে বিশ্বাসী— মানবতায়, তুলে আনেন মণি-লাবণ্যযুক্ত জলকথা। এখানেই শঙ্খ ঘোষের অনন্যতা, স্বতন্ত্রতা এবং পরিচয়— মৃত্যু-অপমান-ক্ষয়ের পর ক্ষয় দেখেন এবং লেখেন কিন্তু তাতে জুড়ে দেন আত্মসমালোচনা, ব্যঙ্গ-চাবুক, গভীর বেদনা এবং স্বপ্ন-ভালোবাসা। তিনি জেগে থাকতে ভালোবাসেন, তবে পাশাপাশি উচ্চারণ করেন—

> ‘‘অপমান বোধ হয়। অপমান বোধ হয়, ভয় দেখিয়ে শাসন করবার এই লজ্জাহীন ফ্যাসিস্ট আয়োজন দেখে। স্ট্র্যাটেজি হিসেবে অনেকে চুপ থাকতে চান সত্যি, কিন্তু প্রতিবাদে এগিয়ে এসে পুলিশের কাছে তাড়িতও হন অনেকে গোটা দেশ জুড়ে। যে-কোনো রকম ঝুঁকি নিয়ে কথা বলেন তাঁরা। ... অনিচ্ছুকের ওপর চাপ

দিয়ে খুব বেশিদিন যে বাঁচে না ক্ষমতা, ইতিহাস কি তাকে শেখায়নি এটা?''[৮৩]

কবির একক ব্যক্তিত্ব সমাজের ব্যক্তি-সমষ্টির দায় বহন করেছে— সকলের সঙ্গে এক করে নিয়েছে এবং প্রকাশ করেছে যথার্থ জীবনকে। এই প্রকাশে কখনো লেগে আছে প্রেম কখনো বা প্রতিবাদ— আত্মসমালোচনাহীন মানুষকে আলোচনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, মুহূর্তে-মুহূর্তে তাঁর কবিতায় যে চাবুকের শব্দ শোনা যায় তা একই সঙ্গে 'তুমি', 'আমি' এবং 'আমরা'কে মারার শব্দ অতঃপর নিজেকে নিয়ে যাওয়া প্রার্থনা-দোয়ারত অবস্থানে। কেননা তিনি আলোকউজ্জ্বল সত্তার অধিকারী— জ্ঞানে-অভিজ্ঞতায়-উপলব্ধিতে এবং প্রকাশে। অন্ধকার থেকে আলোক পথের অনন্য যাত্রী। তাঁর কবিতায় প্রচলিত শব্দ ব্যবহারে যেমন মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি আছে মিথ-পুরাণ-লোককথা ব্যবহারের সফলতা— পরিচয় দিয়েছেন একজন সামগ্রিক শিল্পীর। বিশ্বাস রাখেন ইতিহাসে, ভবিষ্যতে। তাঁর উচ্চারণের ভেতরে যে সংকট তা কেবলমাত্র দেশের সংকটকথা হিসেবে না থেকে সময়ের সারকথা হিসেবে উচ্চারিত। কোলাহলপূর্ণ পণ্য সভ্যতায় তাঁর কবিতার নীরবতা সত্যে পৌঁছবার ঐকান্তিক লড়াই। তিনি পৌঁছতে চান সমাজের কল্যাণশক্তির নিহিত আধারে— দেশের মর্মস্থানে। তাঁর কবিতা সমস্ত হাসিখুশি সর্বনাশের আদরে আদরে ভরে ওঠা ক্ষতের বিরুদ্ধস্থানে নিয়ে যায়। বুর্জোয়া সভ্যতার ভোগ-বিলাসিতা, ব্যক্তি মানুষের সর্বাঙ্গীন অসহায়তা— এইসবের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের অবস্থা যেখানে বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে যাবার মতো অর্থহীন লাবণ্যে লাবণ্যময়ী সময়কে অঙ্কন করেছেন এবং নিজেদের গা-বাঁচোয়া দায়-দায়িত্বকে তীব্র কশাঘাত মারতে পিছপা হননি। তিনি একটি কবিতাতেই থিসিস ও অ্যান্টিথিসিস গড়ে তোলেন অর্থাৎ 'মারের জবাব মার'— অথবা প্রথম অংশে যদি সহজ উচ্চারণ লক্ষ করা যায় তবে দ্বিতীয় অংশেই তীব্র কশাঘাত 'তুমি আজ এমন করে কথা বল মনে হয় শব্দ যেন শব্দের/সন্ন্যাসিনী'। 'শব্দ' যেন শব্দ মাত্র অথচ 'সন্ন্যাসিনী'! এখানেই শঙ্খ ঘোষের অ্যান্টিথিসিস। তবে এইসব স্বর ব্যক্তিস্বর অতিক্রম করে গোষ্ঠীস্বর হয়ে উঠেছে এবং আত্মকেন্দ্রিকতার বদলে আত্ম বিস্তারে-বিস্তারে আত্মোৎঘাটন করেছেন। পূর্বালোচিত যে, তাঁর কবিতা সমগ্রের কবিতা— সেখানে পরাভব, ক্ষয় থাকলেও 'একদিন পারব' উচ্চারিত হয়, হয়েছে বারবার। উচ্চারিত হয়েছে ভালোভাবে বেঁচে থাকার কথা, ভালোবাসার কথা— কেননা, তিনি মনে করেন 'কবির হেরে যাওয়া সাজে না'। না, কোন 'ধর্মীয়তা' বা 'ঐশ্বরিকতা' নয়; তাঁর যোগ আত্মিকতায়। নিভৃতকথনে গড়ে তুলেছেন এক নিজস্ব কাব্যভুবন— যেখানে ২০১০ সাল যেমন বর্তমান তেমনি বর্তমান নকশাল যুগ, ইমার্জেন্সি, খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯), ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, ভিয়েতনাম। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর আত্মপ্রশ্ন— চিরন্তন সত্তার লড়াই। বেঁচে থাকার কথা কালাতীতভাবে— সমস্ত ঘটনারাশির অভিঘাত মথিত হয়ে উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। ''দিনগুলি

রাতগুলি''থেকে ''বাবরের প্রার্থনা'', ''হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ''মালা হয়ে গোটাদেশ জ্বলে ওঠার আগুন বর্তমান। তবে সবটাই ব্যথা উপশমের মতো— বেদনাময় অথচ গভীর ভালোবাসা, উজ্জ্বলতম আলোসন্ধানী। কবি আরও বেশি ব্যক্তিগত আড়াল থেকে মহাসময়ের জটকে ধরেছেন, আত্মবিলোপে নয়, আত্মোৎঘাটনে তাঁর সমাজ দেশ কাল, কবিতা এবং আত্মপরিচয়।

> ''একটাই তত্ত্ব আছে কবির কাছে আর তাঁর কবিতার কাছে, সে হলো তাঁর বেঁচে থাকার তত্ত্ব। তিনি বেঁচে আছেন, সর্বতোভাবে বেঁচে থাকতে চান তিনি, জীবনকে তিনি ভালোবাসেন। যা-কিছু সেই জীবনের পথে, জীবনের সুস্থতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেই সব কিছুকে ভাঙতে চান তিনি। চেতনে, অধিচেতনে, প্রকৃতিতে ভালোবাসায়, ইতিহাসে দর্শনে, ব্যক্তিতে সমাজে মিলিয়ে তাঁর এই সম্পূর্ণাঙ্গ বাঁচা। এই বাঁচাটাই তাঁর কবিতার জীবন।''[৮৪]

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৭, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৫, ১৬।

২. ঘোষ, শঙ্খ : কথার পিঠে কথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৩৬, ৩৭।

৩. তদেব : পৃ. ৩৬।

৪. তদেব : পৃ. ৩৮।

৫. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৭, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২২।

৬. চৌধুরী, কমল (সম্পা.) : স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৯, ১০।

৭. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ন ১৪১৬, পৃ. ৩২।

৮. তদেব : পৃ. ৪৭।

৯. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৭, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৭, ১৮।

১০.খান, রফিক উল্লাহ : কবিতা ও সমাজ, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম বাংলা একাডেমী সংস্করণ ১৯৮৫, বর্তমান সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১।

১১. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.) : নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ২৬।

১২. তদেব : পৃ. ১০৮, ১০৯।

১৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৭, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৩।

১৪. তদেব : পৃ. ৭৯।

১৫. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.): নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ৮৮।

১৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৭১, ৭২।

১৭. তদেব : পৃ. ১৪৭।

১৮. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, প. ৮৮।

১৯. ঘোষ, শঙ্খ (সম্পা.) : এই সময় ও জীবনানন্দ, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি১১০০০১, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ৬।

২০. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৯৪।

২১. ঘোষ, শঙ্খ : কথার পিঠে কথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৯০,

৯১।

২২. তদেব : পৃ. ১৪৮।

২৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ৭৭।

২৪. তদেব : পৃ. ১২৩।

২৫. তদেব : পৃ. ৮৯, ৯০।

২৬. তদেব : পৃ. ৬৩।

২৭. ঘোষ, শঙ্খ : কথার পিঠে কথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২২৫।

২৮. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১২৯।

২৯. Srinivas, M.N. : Social Change in Modern India, Orient Langman Ltd. 1/24 Asat Ali Road, New Delhi-110002, First Published 1966, Reprinted 2007, P. 1.

৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম : পোস্টমডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩, বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১২।

৩১. Lal, Jagadish : The Constitution of India, Delhi Law House, 15, Rajpur Road, Delhi-110054, P. XXIII.

৩২. চৌধুরী, কমল (সম্পা.) : স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৫, পৃ. ৪০।

৩৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৮৮, ১৮৯।

৩৪. তদেব : পৃ. ২২৭।

৩৫. তদেব : পৃ. ২১৪, ২১৫।

৩৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০১, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৭, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৫০, ৫১।

৩৭. তদেব : পৃ. ৫৮, ৫৯।

৩৮. তদেব : পৃ. ৬১।

৩৯. ঘোষ, শঙ্খ : গদ্যসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৮০।

৪০. ঘোষদস্তিদার, গৌতম (সম্পা.) : বিষয় শঙ্খ ঘোষ, রক্তমাংস, এ-৫৮ রিজেন্ট পার্ক, রহড়া, কল-১১৮, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, দ্বিতীয় পরিবির্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৩৯।

৪১. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.) : নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৭।

৪২. গঙ্গোপাদ্যায়, সুব্রত : কবিতায় সময়ের দাগ, পত্রলেখা, ১০/বি কলেজ রোড, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৭৬।

৪৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৬৯, ১৭০।

৪৪. তদেব : পৃ. ৯৬।

৪৫. তদেব : পৃ. ১৯৪।

৪৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৮।

৪৭. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন; বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.) : আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ মাঘ ১৪১৭, পৃ. ২১২, ২১৩।

৪৮. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৭, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৭৩।

৪৯. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি

স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ২৩৫।

৫০. তদেব : পৃ. ২৩৬।

৫১. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন; বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.) : আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ মাঘ ১৪১৭, পৃ. ২৩৬।

৫২. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৮৮, ৮৯।

৫৩. তদেব : পৃ. ১৫।

৫৪. তদেব : পৃ. ৩০।

৫৫. তদেব : পৃ. ৪৯।

৫৬. তদেব : পৃ. ৫৩।

৫৭. তদেব : পৃ. ৭৫।

৫৮. তদেব : পৃ. ৭৭, ৭৮।

৫৯. Beauvoir, Simone de : The Second Sex (Translated and Editing by H.M.Parshley) PICADOR Classics, First Published-1949, First Translation Published-1953, Picader Classics Published-1988. Pan Book, London SW109PG, P. 35.

৬০. ঘোষ, শঙ্খ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭০, চতুর্দশ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৮।

৬১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতা সংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৮১৬, পৃ.৫৬।

৬২. ঘোষ, শঙ্খ : কথার পিঠে কথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪১৭, পৃ. ৮৯।

৬৩. ঘোষ, শঙ্খ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭০, চতুর্দশ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২০।

৬৪. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতা সংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ১৭২।

৬৫. ঘোষ, শঙ্খ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭০, চতুর্দশ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৪২।

৬৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতা সংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ২২২।

৬৭. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ৭৬।

৬৮. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ : বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কল-০৯, প্রথম সংস্করণ ১৯৪১, পঞ্চম মুদ্রণ নভেম্বর ২০১০, পৃ. ১।

৬৯. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ২২৮।

৭০. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.) : নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ, ৪৮, ৪৯।

৭১. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ, পৃ. ৯১, ৯২।

৭২. মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ (সম্পা.): নিঃশব্দের শিখা শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ৫০।

৭৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১৩৯, ১৪০।

৭৪. তদেব : পৃ. ১৪১।

৭৫. তদেব : পৃ. ১৭০।

৭৬. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি

স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৭, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ, পৃ. ১১৮, ১২১।

৭৭. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতাসংগ্রহ-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৪২১, পৃ. ৬৬।

৭৮. তদেব : পৃ. ৫২।

৭৯. তদেব : পৃ. ১৮১।

৮০. তদেব : পৃ. ১৩৮।

৮১. তদেব : পৃ. ২৭০।

৮২. ঘোষ, স্বপনকান্তি (সম্পা.) : রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নকশালবাড়ি থেকে নেতাইগ্রাম, পদাতিক, ২০বি আব্দুল হামিদ স্ট্রিট, কল-৬৯, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৮৪।

৮৩. ঘোষ, শঙ্খ : কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৭, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৬৩।

৮৪. ঘোষদস্তিদার, গৌতম (সম্পা.): বিষয় শঙ্খ ঘোষ, রক্তমাংস, কল-৭০০১১৮, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৫০।